আলোরপথ
২য় সংখ্যা, ১০ আগষ্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ১১ মহাররম ১৪৪৪ হিজরী

ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি

মানুষের জন্য দ্বীনের দাওয়াত

এসো শাশ্বত সুন্দরের পথে (দাওয়াত)

নাগরিক অংশগ্রহণ: একটি উন্নত সমাজের সোপান

ইউরোপে ইসলামের দাওয়াত :কতিপয় চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

আলোরপথ

২য় সংখ্যা, ১০ আগষ্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, ১১ মহাররম ১৪৪৪ হিজরী

উপদেষ্টামণ্ডলী

মোসলেহ ফারাদী
হামিদ হোসাইন আজাদ
নূরুল মতীন চৌধুরী

সম্পাদক

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

সম্পাদনা সহযোগী

মোসাদ্দেক আহমেদ
সৈয়দ তোফায়েল হোসেন

রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন্স

আবু ইহসান
মাহবুবুল আলম সালেহী

পাবলিকেশন্স সহযোগী

জামিল মাহমুদ

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ

ইউসুফ ইসলাম

প্রকাশকাল

আগষ্ট : ২০২২

প্রকাশনায়

MUSLIM COMMUNITY ASSOCIATION

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন (এমসিএ)
3rd Floor Business Wing
38-44 Whitechapel Road
London E1 1jx
www.mcasite.org

সূচিপত্র

মানবতার প্রতি কোরআনের উন্মুক্ত দাওয়াত: কোরআনই একমাত্র বিশুদ্ধ কিতাব ০৪
মুহাম্মদ আবুল হোসাইন খান

মানুষের জন্য দ্বীনের দাওয়াত ১২
মোসলেহ ফারাদী

নাগরিক অংশগ্রহণ: একটি উন্নত সমাজের সোপান ১৪
ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী

ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি ১৭
প্রফেসর ড: মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী

বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তক ডঃ আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মান ২৮
মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আজাদী

ইউরোপে ইসলামের দাওয়াত :কতিপয় চ্যালেঞ্জ ও করণীয় ৩২
আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

এসো শাশ্বত সুন্দরের পথে (দাওয়াত) ৪১
নাজমুন নাহার

সংগঠন সংবাদ ৪৮

সম্পাদকীয়

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীতে মানুষকে প্রেরণ করেছেন একমাত্র তার দাসত্ব করার জন্য। তিনি মানুষকে পৃথিবীতে তার খলিফার মর্যাদা দিয়েছেন। পৃথিবীতে আসার পর মানুষ ভুলে যায় আল্লাহর দেওয়া সেই মর্যাদা ও দায়িত্বের কথা। পথ ভুলে নিজেদের পরিচালিত করে গোমরাহীর পথে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাহকে সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে ফিরিয়ে আনতে প্রতিটি জনপদে এক বা একাধিক নবী ও রসুল প্রেরণ করেছেন। তাদের ওপর নাজিল করেছেন বহু আসমানী কিতাব। যে কিতাবের সাহায্যে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহরা মানুষদেরকে সত্য ও সুন্দরের পথে আহ্বান করতেন। সময়ের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ নবী ও রসুল হিসেবে পৃথিবীতে এসেছেন নবী করিম (সা.)। যার ওপর নাজিল হয়েছিল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাগ্রন্থ আল কোরআন। এই কোরআন পৃথিবীর মানুষকে অতীতের কিতাবের ন্যায় হেদায়েতের পথে বারংবার ডেকে যাচ্ছে।

দাওয়াহ, যার আরবি অর্থ ইসলামের আমন্ত্রণ, সেই শব্দগুলির মধ্যে একটি যেটির দিকে মুসলিম সম্প্রদায়ের অনেক সদস্য গুরুত্ব সহকারে দৃষ্টি দেয় না। অনেক লোক এর গুরুত্ব স্বীকার করে কিন্তু একই সাথে এটিকে ভয় পায় কারণ তারা ভুলভাবে অনুমান করে যে একাজে প্রচুর জ্ঞানের প্রয়োজন। বাস্তবতা সত্য থেকে অনেক দূরে। যে কেউ সুরা আল-ইখলাস (পবিত্রতা) জানেন বা এমনকি তাওহীদ কী তা জানেন (আল্লাহর একত্ব) দাওয়াহ দিতে পারেন। দাওয়াতে নতুন অনেকেই এটা জেনে অবাক হয়েছেন যে, একবার তারা লোকেদের সাথে কথা বলতে শুরু করলে, তারা ইসলাম সম্পর্কে এমন অনেক জ্ঞান উন্মোচন করে যা তারা সত্যিই জানত না যে তাদের কাছে ছিল।

তবুও মানুষ ভুলে যায় যে নবী মুহাম্মদ (সা.) দাওয়াহকে সারা জীবন দিয়েছিলেন। এই পৃথিবীতে তার উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা এবং কুরআনে, আমাদেরকে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,

"তোমার পালনকর্তার পথে দাওয়াত দাও প্রজ্ঞা ও সুন্দর উপদেশ দিয়ে এবং তাদের সাথে এমনভাবে তর্ক কর যা সর্বোত্তম ও করুণাময়।চ (কোরআন ১৬:১২৫)

যদিও এটি প্রত্যেক মুসলমানের জন্য একটি বাধ্যবাধকতা, তবুও অনেকে অপরিচিত ব্যক্তির সাথে কথা বলার ভয়ে এটিকে অবহেলা করে। যাই হোক, মুহাম্মদ (সা.) যে দাওয়াতের মডেলটি ব্যবহার করেছিলেন তা প্রথমে ইসলাম সম্পর্কে তার পরিবারের সাথে কথা বলে শুরু করতে হয়েছিল। পরে, তিনি তার বন্ধুদেরকে দাওয়াত দেন। এর পরপরই, আল্লাহ তাকে সুরা নাজম (দ্য স্টারস) তে জনসাধারণের কাছে দাওয়াহ দেওয়ার নির্দেশ দেন এবং এটিই যখন তিনি কুরাইশ গোত্রের কাছে প্রথম তেলাওয়াত করেন (যে গোত্রে মুহাম্মদ (সা.) জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং উপজাতি যারা তাকে ২৩ বছর ধরে অত্যাচার করেছিল)। তাই দাওয়াহ প্রদানের ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মডেল অনুসরণ করে, আমরা সফলভাবে মানুষের সাথে ইসলাম সম্পর্কে কথা বলার উপায়ে সান্ত্বনা লাভ করতে পারি এবং একই সাথে আমাদের নিজের বিশ্বাস এবং অন্যের বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো অপরিচিত ব্যক্তিদের দাওয়াহ দিতে ভয় পেতে পারে কারণ তারা বন্ধু বা পরিবারের মতো স্বাগত জানায় না। তাই আপনার পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে শুরু করুন এবং আপনি সান্ত্বনা লাভ করার সাথে সাথে অপরিচিতদের দাওয়াহ দেওয়ার দিকে এগিয়ে যান। শুধু মনে রাখবেন যে কেউ কখনো ইসলামিক জ্ঞানের প্রতিটি বিট থাকবে না। তবে আপনি যদি তাওহীদ দিয়ে শুরু করেন, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি আপনি সর্বদা সফল হবেন। সুতরাং দয়া করে আল্লাহর পক্ষ থেকে এই আদেশটি বিলম্বিত করবেন না এবং আপনার যারা ইসলাম থেকে বঞ্চিত তাদের সাথে ভাগ করুন!

মানবতার প্রতি কোরআনের উন্মুক্ত দাওয়াত:

কোরআনই একমাত্র বিশুদ্ধ কিতাব

মুহাম্মদ আবুল হোসাইন খান

কোরআন আল্লাহর কালাম। এটি কোন মানুষ অথবা মাখলুক রচিত কালাম নয়। এ বিতর্ক এড়াবার জন্যই আল্লাহ নিজে চ্যালেঞ্জ করেছেন, দেখি পারলে এ রকম একটি বানিয়ে দেখাও; এমনকি ছোট্ট একটি আয়াত বা আয়াতাংশ রচনা করো দেখি, তাও একা না পারো তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের ডেকে পারলে করে নিয়ে এসো। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল তদানিন্তন আরব সাহিত্যিকরা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কেউই সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে পারেনি এবং পারবেও না। এটিই হলো আল কোরআনের মুজেজা। তাই উলুমুল কোরআন বা কোরআন গবেষকদের ভাষায় আল কোরআনকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে যে,

الكتاب المنزل علي محمد ص بروح القدس نقلا متواترا بلا شبهة لهداية الناس

"এটি এমন একটি কিতাব, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক শক্তিশালী বিশ্বস্ত বার্তা বাহক (জিবরীল) এর মাধ্যমে বিশুদ্ধভাবে নিশ্ছিদ্র পথে অগণিত বর্ণনাকারীদের পরম্পরায় নবী মুহাম্মদ (সা.) এর প্রতি মানবতার পথ প্রদর্শনকল্পে অবতীর্ণ করা হয়েছে।"

কোরআন সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা:

কোরআনই একমাত্র কিতাব যার বিশুদ্ধ হবার উপমা নিজেই। কিন্তু কিতাবটি পাঠানো হয়েছে মানবতার কল্যাণে, এ কথাটি অনেক মানুষ জানে না। বরং উল্টো অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছে। কেউ মনে করে বসে আছে এটি একটি ভাল মান সম্পন্ন তাবিজের কিতাব, জিন-ভূত তাড়ানোর কৌশল ব্যবহারে এটি একটি কার্যকর কিতাব, কতক লোক মনে করছে কোন দুরারোগ্য ব্যাধী থেকে শিফার জন্য লোক হায়ার করে খতম দেওয়ার মোক্ষম কিতাব। কারো আবার ধারণা যে, এটি হলো মানুষ মারা গেলে খতম পড়ে সওয়াব পাঠিয়ে মাগফিরাত হাসিলের পবিত্র কিতাব। আবার কেউ এটিকে মৃত্যু বার্ষিকী পালনের কিতাব হিসেবে ধরে নিয়েছে এবং তার আপনজনের মৃত্যুর তারিখ অনুযায়ী তা বার্ষিক ওরশের মত পালন করাকে জরুরি মনে করে নিয়েছে। আরও কিছু লোক অযীফা আকারে অল্টারনেটিভ রূপ দিয়ে স্থায়ীভাবে কোরআনের কিছু অংশ নিয়মিত পাঠ করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিছু লোক এমন আছে, যারা কোরআনকে রামাদানে হাফেজদের দিয়ে তারাবীতে তিলাওয়াত করানোর কিতাব মনে করে নিয়েছে। এভাবে মানবতার জন্য আল্লাহ প্রদত্ত এ নির্ভুল গাইড বুকটিকে নিজস্ব ও সমাজে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে এর প্রতি জুলুম করে চলেছে। কোন কোন ধারণা আংশিক ঠিক হলেও এ জাতীয় কোন প্রয়োজনে পুরো কোরআন আল্লাহ নাজিল করেননি। আসল কথা হলো, এগুলো মানুষ তৈরি করে নিয়েছে নিজেদের সমাজ, বাপ-দাদার সংস্কৃতি ও পূর্ব প্রতিষ্ঠিত কু-ধারণা এবং শয়তান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন উৎস থেকে। কোরআনকে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে মানুষের সামনে ভুলরূপে উপস্থাপনের এটি এক মহাষড়যন্ত্র। কোরআনের এ সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও ভুল ধারণাগুলো বিবৃত করে এবার কোরআন নাজিলের নিগূঢ় তথ্য আমাদের জানতে হবে।

মূলত কোরআন এসেছে নির্ভুল পথপ্রদর্শন করতে:

কোরআন কিন্তু উপরিউক্ত কোনও উদ্দেশ্য সাধনে আমাদের প্রতি পাঠানো হয়নি কিংবা রসুল (সা.) আমাদের কাছে তা এজন্য আমানত রেখে যাননি। বরং আমানত রেখেছেন এ জন্যে যে, আমার পরে তোমাদের হেদায়েতের পরিপূর্ণ সন্ধান দিতে এটি একমাত্র যুতসই কিতাব। তিনি বলেছেন,

هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ

"যে কোরআন মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ, আর তা ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারীও।" (বাকারা: ১৮৫)

যারা বাস্তব জীবনে তা মেনে চলবে, তাঁরা ইহ ও পরকালে সফলতা লাভ করবে, তাই আল্লাহ বলেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

"অতঃপর তোমাদের যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার ইহকালে না কোন ভয় থাকবে, না পরকালে চিন্তাগ্রস্ত ও শঙ্কিত হবে"(বাকারা: ৩৮)

অপর আয়াতে তিনি বলেন,

وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

"আর যারা আল্লাহর কথা (কোরআনকে) দৃঢ়ভাবে ধরবে, তারা সহজভাবে হেদায়েত প্রাপ্ত হবে।" (আলে-ইমরান: ১০১)

অন্যত্র আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ

"অতঃপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে হেদায়েত আসে, তখন যে আমার দেখানো পথ অনুসরণ করবে, সে পথভ্রষ্ট হবে না এবং কোন কষ্টেও পতিত হবে না।" (ত্বাহা: ১২৩)

বিশ্ববাসীকে দাওয়াত দানই কোরআনের মূল কাজ, এ কাজটি একটি দারসের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য এম.সি.এ'র এ আয়োজন।

দারসুল কোরআন: দ্বীনের দাওয়াত

আয়াত এবং তার সরল অর্থ নিম্নরূপ:

وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

নাম ছাড়া একজন দাঈর বক্তব্য নিম্ন আয়াতগুলোতে খুবই সুন্দর করে উপস্থাপন করা হয়েছে এভাবে যে, "হে আমার কওম, ব্যাপার কি, আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই মুক্তির দিকে, আর তোমরা আমাকে দাওয়াত দিচ্ছ জাহান্নামের দিকে। তোমরা আরও দাওয়াত দিচ্ছে যাতে আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে শরীক করি এমন কিছুকে, যার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। অথচ আমি তোমাদেরকে দাওয়াত দেই একমাত্র পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে। এতে সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দাও, ইহ ও পরকালে এর কোনই ভিত্তি নেই! কেননা আমাদের প্রত্যাবর্তন তো পরিশেষে আল্লাহরই দিকে এবং (জেনে রাখা ভাল) সীমালঙ্ঘনকারীরাই হবে জাহান্নামী। (আমার দাওয়াত তোমরা রাখলে না, তবে) আমি তোমাদেরকে যা বলে গেলাম, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার সকল ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাহ হিসেবে আমাদের পর্যবেক্ষণ করছেন।" (সুরা মু'মিন : ৪১-৪৪)

আয়াতাংশের সংক্ষিপ্ত তাফসীর:

৪১-৪২ আয়াত: নির্ভরযোগ্য সূত্রে কোন তাফসীরে নাম মিলেনি এমন এক দাঈর দাওয়াতের ভাব-ভঙ্গির কথা এখানে সুন্দর করে ফুটিয়ে উঠেছে। দাঈ তাঁর জাতির লোকদের বলছেন, আমার কী হলো আমি বুঝি না? আমি তোমাদের এমন একটি নিশ্চিত এবং কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচানোর জন্য নাজাতের দিকে দিবানিশি প্রাণপণ ডাকছি তো ডাকছিই। কিন্তু আমি তোমাদের শুনাতে পারছি না কেন। অথচ তোমরা আমাকে উল্টো আগুনের লেলিহান শিখার দিকে কোন যুক্তি ছাড়াই না বুঝে ডাকছ, আরও ডাকছ আমাকে যেন আমি আল্লাহকে অস্বীকার করি এবং তাঁর সাথে তোমাদের মতই শিরক করি। অথচ সে বিষয়ে আমার সামনে তোমাদের পক্ষ থেকে কোন দলিল-প্রমাণ নেই। অথচ আমি তোমাদেরকে প্রমাণ সহকারে এমন এক শক্তিশালী রবের দিকে ডাকছি, যার শাস্তি প্রদান অথবা ক্ষমা করার ক্ষমতার কোন তুলনাই হয় না। তবে তিনি এত শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর শক্তিকে প্রয়োগ করার আগে মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়ার সুযোগ দেন, কেননা তিনি মানুষ সৃষ্টি করেনি শাস্তির জন্য, তাই তিনি শাস্তি প্রয়োগের চাইতে ক্ষমার করে দেওয়ার ক্ষমতা অধিক প্রয়োগ করতে চান। অতএব শাস্তি থেকে রেহাই পেতে তোমরা আমার দাওয়াত কবুল করো।

৪৩-৪৪ আয়াত: তবে মনে রেখ, এ কথা স্বতঃসিদ্ধ এবং কোন সন্দেহ নেই যে, তোমরা আমাকে যার দিকে দাওয়াত দিচ্ছ, ইহ ও পরকালে তা কাজে লাগবে বলে কোন ভিত্তি বা প্রমাণ নেই! আর কেয়ামতে বিনা প্রমাণে কেউ কোন খোঁড়া যুক্তি দিয়ে পার পাবে না। কেননা তিনি সেদিন ক্ষমতা প্রয়োগের আগে ইনসাফ প্রয়োগ করবেন, অত্যন্ত কড়া নিয়ম এবং প্রমাণের ভিত্তিতে সকল বিচারকার্য সম্পাদন করবেন। যেহেতু আমাদের প্রত্যাবর্তন পরিশেষে তাঁরই দিকে। যারা অহংকার করে দায়ীর কথা মানে নাই, সেসব সীমালঙ্ঘনকারীরাই জাহান্নামে যেতে সেদিন বাধ্য হবে এবং তাদের বলা হবে যে, এতসব বুঝানোর পর দুনিয়ায় আমার দাওয়াত তোমরা রাখলে না, এজন্য তোমাদের সেদিন খুব আফসোস করতে হবে। আমি তোমাদের যা বলে গেলাম, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে যাবে। আমি আমার ব্যাপার আগে থেকেই আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছি। নিশ্চয় তোমরা-আমরা সকল আল্লাহর দৃষ্টিগোচরে এখন তো আছি এবং পরকালেও তাঁর দৃষ্টির সীমানায় থাকব, তাঁকে কেউ এড়াতে পারবো না। সেদিন বিচারকের সামনে কোন খোঁড়া যুক্তি যেমন পেশ করা যাবে না তেমনি কোন ভুয়া রিপোর্টও প্রদর্শন করা যাবে না। সুপারিশ কাজে আসবে না, ভুল তথ্য দিতে গেলে উল্টো গোপনে করা পাপের ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ করে দেওয়া হবে। অতএব সাবধানে দুনিয়ার জীবন অতিবাহিত করো এবং তাঁর সাথে পরকালের নির্ঘাত সাক্ষাতের জন্য তৈরি হও।

দাওয়াতের অর্থ:

দাওয়াতের অর্থ হচ্ছে কাউকে ডাকা বা ডাকাডাকি করা করা, খেতে দাওয়াত করা, নোটিশ টানানো, এলান করে জানানো বা বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে দাওয়াত দেওয়া ইত্যাদি। তবে পারিভাষিক অর্থে "আল্লাহর দ্বীন মেনে চলার জন্য মানুষকে ডেকে এনে যা কথাগুলো বুঝিয়ে বলা হয় তাই দাওয়াত।" এ দাওয়াত দান মুমিনের উপর জরুরি কর্তব্য বটে, তবে দাওয়ায়াত দানের পর কেউ তা গ্রহণ না করলে তাঁকে একদম জবরদস্তি করে এ পথে

আনার দায়িত্ব দাঈদের নয়। তবে নিজ সন্তান কিংবা পরিবারের আপনজন হলে দায়িত্বের কারণে খানেকটা জোর চালাতে মানা নেই। অবশ্য ছোটদের প্রতি আদরে মাখা দাওয়াতের পরিবর্তে মারধোর করে দাওয়াত দান সঠিক হবে না। এবার কিসের দাওয়াত দেবেন? তাওহীদ, রেসালত ও আখেরাতের প্রাধান্য দাওয়াতের মধ্যে থাকতে হবে। যেমন উপরের দাঈ কাতর কণ্ঠে আখেরাতের দিকেই ডাকছেন।

দাঈর দাওয়াত হচ্ছে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের প্রতি:

কোরআন মানুষকে গ্যারান্টি সহকারে এ দাওয়াত দিতে চাচ্ছে যে, এ পথ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল পথই ভ্রান্ত পথ, আর কেবলমাত্র কোরআনের পথই হচ্ছে সহজ-সরল সিরাতুল মুস্তাকিমের পথ, পরকালে জান্নাতে পৌঁছার একমাত্র সরল পথ, এ পথে চললেই মুক্তি নিশ্চিত। আর যারা এ পথে আসবে না, তারা ইহ ও পরকালে চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ততার সম্মুখীন হবে। আল্লাহ বলেন:

أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

"আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে কিন্তু তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর মাঝে রয়েছে। আর যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণের (কোরআনের) ব্যাপারে কঠোর, তাদের জন্যে দুর্ভোগ। তারা লিপ্ত রয়েছে পরিষ্কার গোমরাহীতে।" (সুরা যুমার: ২২)।

অপর জায়গায় আরও পরিস্কার করে বলা হয়েছে:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন (জীবন ব্যবস্থা হলো) একমাত্র ইসলাম।" (আলে-ইমরান: ১৯)।

আরেক আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চিত জেনে রাখ যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সুরা বাকারা: ২০৮)

এটিই কোরআনের দাওয়াত, মানুষকে এ দাওয়াত দিতেই কোরআন এসেছে।

কোরআনের দাওয়াত কাদের প্রতি:

আল-কোরআন মানুষকে তিন ভাগে বিভক্ত করে দাওয়াত দিচ্ছে:
১. সাধারণ মানুষের প্রতি "আয়্যুহান্নাস" বলে দাওয়াত,
২. বিশ্বাসীদের প্রতি "আয়্যুহাল্লাযিনা আ-মানু" বলে এবং
৩. মুনাফিকদের প্রতি "আল্লাজিনা না-ফাকু" বলে।
এখানে প্রথম দলকে মূলত অবিশ্বাসী দল হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে আর পরবর্তী দুদলকে মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত করে সম্বোধন করা হয়েছে। কেননা মুনাফিক মুমিনদের মাঝ থেকেই তৈরি হয়। পুনরায় সুরা ওয়াক্বিয়াতে ১. আসহাবুল ইয়ামিন, ২. আসহাবুশ শিমাল ও ৩. সাবিকুনাল আউয়ালুন বলে ঐ ৩ দলের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। উপরের মত এখানেও মানুষের ৩ দলকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে, যেমন: প্রথম দল হচ্ছে "আসহাবুল ইয়ামীন, ও সাবিকুনাল আউয়ালুন" ডানপন্থী বা ভাল মুমিনদের পরিচয়, আর দ্বিতীয় দল হচ্ছে "আসহাবুশ শিমাল" বা বামপন্থী দল। আল্লাহকে রব হিসেবে কবুল করতে মানবতার প্রতি কোরআনের এ উন্মুক্ত দাওয়াত।

১. মুসলিম-অমুসলিম বিশ্ব-মানবতার প্রতি কোরআনের বিশ্বজনিন দাওয়াত:

কোরআনের মূল বিষয়বস্তু হলো মানুষ ও মানুষের জীবন। মানুষের জন্যই কোরআন এসেছে আল্লাহর পক্ষ থেকে খোলা চিঠি হিসেবে তার দায়িত্ব ও করণীয় বুঝাবার জন্যে। কিসে তার কল্যাণ এবং কিসে তার অকল্যাণ রয়েছে, এতে তা বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। কল্যাণকর জিনিস সে গ্রহণ করবে এবং অকল্যাণকরগুলো পরিহার করে চলবে। এ কথাটি আল্লাহ এভাবে বিবৃত করেছেন:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ

"যারা মনোনিবেশ সহকারে (কোরআনের) কথা শুনে, অতঃপর যা উত্তম, তার অনুসরণ করে। তাদেরকেই আল্লাহ সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং তারাই বুদ্ধিমান" (সুরা যুমার: ১৮)।

এ জন্য মানুষকে আল্লাহর ভয় দেখাতে বিশ্ব মানবতার প্রতি কোরআনের আহ্বান হচ্ছে: "হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তার এবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন। তাতে আশা করা যায়, তোমরা আল্লাহভীতি অর্জন করতে পারবে" (বাক্বারা: ২১)।

অপর এক জায়গায় আল্লাহ আরও বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় করে চলো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন।" (আলে-ইমরান: ০১)।

আল্লাহ নবী পাঠিয়ে মানুষকে অন্যত্র দাওয়াত দিচ্ছেন এই বলে, "বলে দাও, হে মানব মণ্ডলী। তোমাদের সবার প্রতি আমি আল্লাহ প্রেরিত রসুল, সমগ্র আসমান ও জমিনে যার রাজত্ব। একমাত্র তাঁকে ছাড়া আর কারো উপাসনা চলবে না। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা সবাই বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহর উপর এবং তাঁর প্রেরিত শেষ নবীর উপর, যিনি বিশ্বাস রাখেন আল্লাহর এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর। তোমরা তাঁরই অনুসরণ করো, যাতে সহজে পথ প্রাপ্ত হতে পার।" (আল-আরাফ: ১৫৮)।

কোরআনের মধ্যে এ জাতীয় অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

২. মু'মিনদের প্রতি দাওয়াত:

মুমিনদের সম্বোধন করে আল-কুরআনে একেক বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে গিয়ে আলাদা আলাদাভাবে দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

তার মধ্য থেকে মুমিনদের জন্য এমন কিছু আয়াত উপমা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন পূর্ণাঙ্গ ইসলাম মানার দাওয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাংক অনুসরণ কর না। নিশ্চিত যে, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (বাক্বারা: ২০৮)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ۗ

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, সেদিন আসার পূর্বেই তোমরা তা থেকে ব্যয় কর, যাতে না আছে বেচা-কেনা, না আছে সুপারিশ কিংবা বন্ধুত্ব। আর কাফেররাই হলো প্রকৃত জালেম।" (বাক্বারা: ২৫৪)।

সুদ বর্জন করার দাওয়াত:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা সত্যিকার ঈমানদার হয়ে থাক।" (বাক্বারা: ২৭৮)।

দুনিয়াতে কোন বিষয়ে সঠিকভাবে স্বাক্ষ্য দিতে নির্দেশ দিচ্ছেন এভাবে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ

"হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানের উপর অবিচল থাকবে" (মায়েদা: ০৮)।

অমুসলিমদের সাথে চলার নীতি কি হবে, মুসলমানদের জন্যে তা বিবৃত করছেন এভাবে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۘ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ

"হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। তারা নিজেরা একে অপরের বন্ধু। তা জানা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।" (মায়েদাহ: ৫১)

এখন যে নির্ভুল কোরআন থেকে আমরা দাওয়াত প্রদান করব, সে কিতাবের মৌলিক দাওয়াতটি কোন কোন বিষয়ে তা আমরা এখানে আলোচনা করব:

কোরআন কিসের দাওয়াত দেয়:

কোরআন মুমিনদের প্রতি দাওয়াত দেয় মূলত ইসলাম মেনে চলার, আর অমুসলিমদের প্রতি দাওয়াত দেয় রবকে মানার। এ বিষয়টি সামনে রেখে কোরআন গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে আমরা দাওয়াতের বিষয়গুলোকে এ ভাবে সাজাতে পারি:

কোরআন মূলত ৬টি বিষয়ের দাওয়াত দেয়:

১. তাওহীদ: 'তাওহীদ' নামে কুরআনে সুরা ইখলাস দিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিচয় থাকলেও আল্লাহ যে এক এবং একক, তা বুঝাবার জন্য মানুষকে আল্লাহ পুরো কোরআনজুড়ে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। কোরআন পড়লে যার খবর আমরা পাতায় পাতায় পাই। কেননা ঐ সময় গোটা আরব জাহান ও বিশেষ করে মক্কার পৌত্তলিকদের মধ্যে এটি নিয়েই সবচেয়ে বেশি ঝামেলা ছিল। কেননা পৌত্তলিকরা অনেক দেবতা, মূর্তি বা অসংখ্য রবে বিশ্বাসী ছিল। তারা এটি জানত না যে, এ মূর্তিগুলো মূলত তাদের প্রাচীন সময়ের নেককার মানুষের অবয়ব দিয়ে তারা পূজার করার নিমিত্তে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বা পাহাড়ের উঁচু স্থানে দৃশ্যমান করে টানিয়েছে; যাতে পরবর্তী জেনারেশনের কাছে শির্ক বলে বুঝানো কঠিন হয় এবং তারা ধীরে ধীরে এটিকে প্রথমে সম্মান ও পরে পূজা বা পূজনীয় ব্যক্তি হিসেবে সরকারি কিংবা বেসরকারিভাবে ইবাদতের যোগ্য মনে করে আরাধনা করে। আল্লাহ তায়ালা এর মোকাবেলায় রসুল (সা.) কে পাঠিয়ে শির্কের মূলোচ্ছেদন করতে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন। বিশ্ববাসীকে তাওহীদ ও শির্কের পার্থক্য বুঝাতে এবং একত্ববাদের দাওয়াত দিতে সুরা কাফিরুন ও ইখলাসসহ অসংখ্য দলিল-প্রমাণ সহকারে নবী পাঠিয়েছেন।

২. রিসালাত: আল্লাহর একত্ববাদ মেনে নেওয়ার সাথে সাথে নবী (সা.)-এর শরীয়ত পূর্ণাঙ্গভাবে মেনে নেওয়ার দাওয়াত দিতে রসুলদের আগমন। নবী-রসুলদের মূল দায়িত্বই ছিল এটি, কোরআন অধ্যয়ন করলে এর ভুরি ভুরি প্রমাণ মেলে। অতএব কেবল তাওহীদ মানলেই হয় না, বরং রিসালাতের উপরও সমভাবে ঈমান আনতে হয়, নতুবা ঈমান পূর্ণাঙ্গতা পায় না। কাজেই নবী যা কিছু নিয়ে এসেছেন; তার আনিত পূর্ণাঙ্গ নিয়ম-কানুন মানার অর্থই হলো রিসালাতে বিশ্বাস স্থাপন। যেমন কেউ নবী-রসুল আল্লাহর প্রেরিত এ কথা মানল বটে, কিন্তু তাঁদের আনীত শরীয়ত মানলো না, তাহলে তার নবী মানি এ কথার কোনই মূল্য নেই।

৩. নির্ভুল কিতাব: আল্লাহ যে কিতাব নবী (সা.)-এর মাধ্যমে উম্মতকে সরল পথ দেখাতে পাঠিয়েছেন, এ কিতাবটি সকল মানব ত্রুটির ঊর্ধে, এতে কোন বেমাননান কিছু নেই, প্রয়োজনের চেয়ে কম কিছু নেই, আবার অযথা বাড়তিও কিছু নেই, একান্ত যা যা অনাগত ভবিষ্যত মানবতার জন্য প্রয়োজন, তাই এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অতীতের উম্মত (বিশেষকরে আহলে-কিতাব: ইয়াহুদি ও খৃষ্টান) তাদের কিতাবকে তারা তাদের সুবিধায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে নিয়েছিল। এজন্য আল্লাহ এ উম্মতকে গাইড বুক হিসেবে কোরআন দিয়েছেন, তাদের পথের দিশা পেয়ে জীবন চালানোর জন্যে। কিন্তু কিতাবের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর নিজের কাছেই রেখেছেন। ফলে এ কিতাব আজও নির্ভুল এবং কেয়ামত পর্যন্ত কেউ প্রচেষ্টা চালিয়েও একটি নোক্তা বরাবর পরিবর্তন করতে পরবে না।

৪. আখেরাত: পরকালীন চিন্তা-চেতনা যাদের নেই, তাদের কথা

আমাদের এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়। আখেরাত হচ্ছে মুমিন জীবনের অন্যতম লক্ষ্য। এ ঈপ্সীত লক্ষে পৌঁছার জন্যে তৎকালীন মক্কাবাসী জনগণের প্রতি নবী (সা.)-এর দাওয়াত ছিল। তারা এ দাওয়াতকে অস্বীকার করেছে। কেননা তারা দুনিয়ার জীবনের বিপক্ষে আরেক জীবনের কথা মানতে রাজী ছিল না। পরকালকে তারা আদৌ বিশ্বাস করতো না। এমনকি পরকালের কথা বললেই তারা এ নিয়ে হাসাহাসি করত এবং রসুল (সা.)-এর সাথে বিদ্রুপ করত। অতএব মানুষের আসল মনুষ্যত্ত্বের পরিচয় পরকাল বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত। যারা পরকাল বিশ্বাস করে তারাই প্রকৃত ভাল মানুষ, আর যারা তা মানে না তাদের জীবনটি মূলত: লাগামহীন, তারা স্বাধীন, তারা মনে করে তারা জবাবদিহি মুক্ত। অথচ আল্লাহ বলছেন,

وَقِفُوهُمْ ۖ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ

"এবং তাদেরকে থামাও, তারা (এক্ষুনি) জিজ্ঞাসিত হবে।"

৫. ইসলাম হচ্ছে বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ দ্বীন: আল্লাহর প্রেরিত দ্বীন হচ্ছে পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ। যার কোন বিকল্প এবং নকল নেই। এটি একমাত্র ও নিখুঁত এবং জীবন বিধান হিসেবে নির্ভরযোগ্য। যা মানবতার কল্যাণকর সকল জিনিসের সমাধান দেয়।

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى
وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

"আমি আপনার প্রতি এমন গ্রন্থ নাযিল করেছি, যার ভেতর প্রত্যেক বস্তুর সুস্পষ্ট বর্ণনা, হেদায়েত, রহমত এবং মুসলমানদের জন্যে সুসংবাদ বর্ণিত রয়েছে।" (সুরা নাহল: ৮৯)।

আল্লাহ তা'লা অন্যত্র বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও' (বাক্বারা: ২০৮)।

সুতরাং যে বা যারা এ কিতাব মেনে চলবে বা জীবনের জন্য পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করবে তাদের জীবনেই সফলতা লাভ সম্ভব। আর যারা এ দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ হিসেবে মানতে পারবে না অথবা গ্রহণ করবে না তাদের জীবন ধ্বংস হতে বাধ্য, কেয়ামতে তারা আল্লাহর অনুগ্রহ লাভে চরমভাবে ব্যর্থ হবে।

৬. দুনিয়ার সুন্দর জীবন গঠন: যারা এভাবে ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করবে তাদের জীবনটাকে ইসলামের আলোকে গড়ে তুলবে, তাঁরাই হবে প্রকৃত ও সফল মুমিন, যে জীবনের উদ্দেশ্যে মানুষকে প্রেরণ করা হয়েছে। তাই আল্লাহ বলেন,

وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

"আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, হে আমাদের রব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও সকল কল্যাণ দান কর এবং আখেরাতেরও সমুদয় কল্যাণ দান কর এবং আমাদেরকে জাহান্নামের কঠিন ও পীড়াদায়ক আযাবের মুখোমোখি হওয়া থেকে রক্ষা কর।" (বাক্বারা: ২০১)।

অপর আয়াতে আল্লাহ তাদের ব্যাপারে আরও বলেন,

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

"যাদের মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যারা নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যাদের কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তাদের আনুগত্য করবেন না।" (কাহফ: ২৮)

অতএব দুনিয়াদার বা দুনিয়াপূজারী যারা তাদের জীবন অনুসরণ করতে আমাদের মানা করা হয়েছে এবং যারা দুনিয়াকে এড়িয়ে নয় বরং দুনিয়ার জীবনকে কাজে লাগিয়ে পরকালকে প্রাধান্য দিয়ে চলতে জানে, তাঁদের জীবনই প্রকৃত অনুসরণযোগ্য জীবন, আল্লাহ আমাদের অনুসরনের তৌফিক দিন।

এ ছাড়া মানব মস্তিষ্ক প্রসূত যতকিছু রয়েছে, তা সবই হচ্ছে বিভ্রান্তি: মানুষ নিজস্ব মাথা খাটিয়ে যত চিন্তা করে এবং তার চিন্তার খোরাক যদি হয় নির্দিষ্ট কোন একটি আদর্শ অথবা থিওরি তাহলে তা হবে সম্পূর্ণ বেঠিক চিন্তা, যার কথা কুরআনে এভাবে এসেছে: হাওয়া বা নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, বিনা প্রমাণে বিভিন্ন বুদ্ধিজীবীদের অন্ধ অনুসরণ, নফস বা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ অথবা দেখাদেখির ভিত্তিতে মানুষকে রোল মডেল হিসেবে অনুসরণ ইত্যাদি। এ ভ্রান্তি থেকে মানুষকে বাঁচানোই হলো দ্বীনের দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। এ দাওয়াতকে সমুন্নত করতে আমাদেরকে অনুসরণ করতেই হবে একমাত্র মানবতার জন্য প্রেরিত কিতাব, যার কথা আল্লাহ আমাদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কোরআনের এ নিখুঁত পথ নির্দেশনা ছাড়া মানবতার সামনে আর কোন বিকল্প নেই।

কোরআন টমটমের মত মানুষকে জান্নাতের পথ দেখায়

এ কোরআন আমাদের জন্য একমাত্র সঠিক পথ নির্দেশনা, যা পৃথিবীর বুকে বার বার প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ هَـٰذَا الْقُرْآنَ يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ
يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

"এই কোরআন সবচেয়ে সহজ-সরল এবং সৎকর্ম পরায়ণ মুমিনদেরকে নিশ্চয়তার সাথে (টমটমের মত) সঠিক পথ প্রদর্শন করে (ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেয়) এবং সুসংবাদ দেয় এই বলে যে, তাদের জন্যে রয়েছে মহাপুরস্কার (জান্নাত)।" (ইসরা: ৯)।

তাই এই কোরআন মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথ যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ। যা এখনো পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ এড়িয়ে চলছে। তারা জানে না যে, কোরআন এড়িয়ে চললে একদিন কী যে বিপদ হবে, কত অসহায়ত্বের স্বীকার হতে হবে, যেদিন কেউ কারো সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারবে না।

কোরআন এড়িয়ে চলার বিপদ:

যারা কোরআন শিখতে এগিয়ে আসবে না, ইহকালে শয়তানকে তাদের সঙ্গী করে দেওয়া হবে এবং পরকালে তাদের অন্ধ করে উঠানো হবে। আল্লাহ তায়ালা কুরআনে কারিম অবতীর্ণ করেছেন মানুষের ইহ ও পরকালীন কল্যাণের জন্য। যারা তা বুঝবে, তারা পরকালীন কল্যাণ লাভে সমর্থ হবে। আর যারা কোরআন বুঝার চেষ্টা করবে না, তাদের ক্ষতির দিকগুলো কোরআন থেকে এখানে পেশ করছি।

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ
وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ

"যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণ (কোরআন) থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্যে এক মরদুদ শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার জীবন-সঙ্গী। আর শয়তানরাই মানুষকে (বিভিন্ন কৌশলে খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে) সৎপথে বাধা দান করে, কিন্তু মানুষ মনে করে যে, তারা সঠিকপথে রয়েছে।" (যুখরুফ: ৩৬-৩৭)

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ

"তোমাদের সামনে কি আমার আয়াতসমূহ পঠিত হত না? তোমরা তো সেগুলোকে মিথ্যা বলতে। তারা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের দুর্ভাগ্যই আমাদের বিভ্রান্ত করেছে। হে রব! এ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার কর; আমরা যদি পুনরায় তা করি, তবে আমরা গুনাহগার হব। আল্লাহ বলবেন, তোমরা ধিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাক এবং আমার সাথে তোমাদের কোন কথা হবে না। (সুরা মুমিনুন: ১০৫-১০৭)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا

وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ

"এবং যে আমার স্মরণ (কোরআন) থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ করে দেওয়া হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" (ত্বাহা: ১২৪)

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ ۖ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ

"অতএব, আপনার প্রতি যে ওহি নাযিল করা হয়, আপনি তা দৃঢ়ভাবে মেনে চলুন। তাহলেই বুঝব যে, আপনি সরল-ঠিক পথে রয়েছেন। মূলত এটা আপনার ও আপনার উম্মতের জন্যে পাঠিয়েছি এবং শীঘ্রই আপনারা জিজ্ঞাসিত হবেন।" (যুখরুফ: ৪৩-৪৪)

কোরআনের প্রতি মুমিনের করণীয় ৬টি:

কোরআন আল্লাহর কালাম এবং মানবতার পথ প্রদর্শক, এ কথার উপর ভালভাবে ঈমান এনে তার প্রতি করণীয় কাজগুলো ধাপে ধাপে করতে থাকা সকল ঈমানদারের জন্য জরুরি, যথা:

১. ছহীহ করে কোরআন পড়তে সক্ষম হওয়ার তাগিদে তাজবীদের কোর্সে ভর্তি হওয়া

২. দৈনিক কম করে হলেও কিছু না কিছু তিলাওয়াত করতে নিয়মিত অভ্যাস করা

৩. কোরআনের অর্থ বুঝা এবং গবেষণার উদ্দেশ্যে সম্ভব হলে কোন কোর্সে ভর্তি হওয়া

৪. কোর্স থেকে যা বুঝেছেন, পরিবারের সবাই মিলে তার উপর আমল শুরু করা

৫. যা আমল করছেন, তা সকল মানুষের কাছে পৌঁছাতে দাওয়াতি কাজ চালু করা

৬. যে নিজে পড়ে এবং অপরকে পড়ায়, সেই শ্রেষ্ঠ উম্মত, সেটা হাসিল করতে কাউকে পড়াবার উদ্যোগ গ্রহণ।

তাই আপনি নিজে শ্রেষ্ঠ হতে কমপক্ষে নিজের প্রিয়জন ও সন্তানদের পড়াবার উদ্যোগ নিন। নিজে পড়ানো শুরু করুন। না হয় পয়সা খরচ করে ভাল উস্তাদ রেখে পড়ানোর ব্যবস্থা করুন। অথবা যারা পড়ায় তাদের যে কোনভাবে সাহায্য করুন। মক্তব খুলে, মসজিদে পাঠিয়ে নতুবা লজিং দিয়ে কিংবা সময় ও পয়সা দিয়ে এ কাজগুলো আঞ্জাম দিন। তাহলে আপনি কোরআনের বন্ধু হতে পারবেন। উপরিউক্ত এ ছয়টি কাজ না করলে কোরআনের বেলায় আমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়া সম্ভব নয়। তাই মানুষের কাছে কোরআনের দাওয়াত পৌঁছাতে নিম্নে কিছু কৌশলের অবতারণা।

অপরকে কোরআনের প্রতি কিভাবে দাওয়াত দেবেন

১. মাসহাফ কিনে ব্যাপকহারে বিতরণ

কোরআনের কপিকে আরবিতে মাসহাফ বলে। বাংলা কোরআনের কপি কিনে কিনে ব্যাপকহারে পড়ার জন্য মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দিতে পারলে আপনি কেবল এক কপি কোরআন পৌঁছাননি বরং আপনি কারো বাড়িতে কষ্ট করে গিয়ে ওয়াজ-নসিহত করার পরিবর্তে সরাসরি আল্লাহর কালামের একটি কপি পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা এ কপিটি সারা জীবন পড়বে এবং আপনি বিশাল ছওয়াবের অধিকারী হয়ে গেলেন। তারা আরবী মূল কোরআন তো পড়বেই, সাথে সাথে অনুবাদ পড়ে কোরআন কি জন্যে এসেছে এবং আল্লাহ এতে কী বলতে চেয়েছেন তাও তাঁদের জানার সুযোগ করে দিলেন; যে কাজটি ফরজ ছিল তাদের জন্য। কেননা তিলাওয়াত করা সর্বোত্তম নফল ইবাদত, কিন্তু বুঝে বুঝে পড়া বা অধ্যয়ন করা তো ফরজ। এজন্য আল্লাহর পথে কিছু পয়সা খরচ করা বিত্তশালী মুমিনদের জন্য জরুরি দাওয়াতি কাজ, এটা করলে এ কোরআন কেয়ামতে আপনার জন্য সুপারিশ করবে।

২. কোরআন শিক্ষার সাপ্তাহিক ক্লাস বা হালাকায় বসা

দেশে-বিদেশে অনেক মসজিদে অথবা দ্বীনি ভাইদের বাড়িতে কোরআনের হালাকা বা ক্লাস হয়ে থাকে। এসব ক্লাসে আপনি সন্তানসহ বসুন, বড়ো বড়ো সন্তানদের বন্ধু-বান্ধবসহ বসতে বলুন, আপনার স্ত্রীকে মহিলাদের সাথে বসতে বলুন। যারা একটু

ভাল কোরআনের দারস দিতে বা তাফসির করতে পারে তাদের ক্লাসে বসুন। কোরআনের আসল ম্যাসেজ বুঝতে পারবেন, শিখতে পারবেন অনেক কিছুই। নিজে শিখলে অপরকে শিখাতেও পারবেন। আপনি ধীরে ধীরে কোরআনের দাঈ হতে পারবেন, কোরআনের প্রতি আপনার যে দায়িত্ব রয়েছে তা আমল করতে পারবেন। কোরআন তো এ দায়িত্ব দিয়েছে শুধু আপনাকে নয় বরং সবাইকে, তাহলে এ বিশাল দায়িত্ব পালনে আপনি এগিয়ে আসুন, আপনার আসার কারণে আপনার পরিবারসহ আরও অনেকেই এগিয়ে আসবে ইনশাআল্লাহ, আপনি এতে বড়ো আজর পাবেন। আশা করা যায়, এ কোরআন কেয়ামতে আপনার জন্য সুপারিশ করবে।

৩. বিয়েতে বা বন্ধু-বান্ধবদের উপহার দান

বিভিন্ন মসজিদে কিংবা আপনার বন্ধু-বান্ধবদের অনুবাদসহ কোরআন উপহার দিন। যে কারো বিয়েতে আমরা সর্বদা বিভিন্ন তৈজসপত্র বা ফুল উপহার দেই। কিছুদিন পর যা ভেঙে যায়, উপহার-সামগ্রী খুব বেশি দিন টিকে না, কিন্তু কোরআনের একটি কপি দিলে দম্পতি নিজে এবং বাড়ির মানুষ হামেশা পড়তে পারবে। সহজে নষ্ট হবে না এবং আজীবন তা হেফাজতে রাখা হয় এবং পড়ে পড়ে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা সহজ হয়। তাই কোরআনের কপি কিনে উপহার দিন, যত পড়া হবে, আপনি তত ছওয়াব পেতে থাকবেন এবং এতে করে এ কোরআন কেয়ামতে আপনার জন্য সুপারিশ করবে।

৫. নিজ সন্তানদের শিক্ষা দিয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা

আপনার সন্তানদের ছোটবেলা থেকে কোরআনের এ জাতীয় দাওয়াতি কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে এক বিশাল দায়িত্ব পালন করতে পারলেন। এ কাজে লাগাতে পারলে তাঁরা জীবনভর যত দাওয়াতি কাজ করবে তার ছওয়াব আপনি কবরে গেলেও পেতে থাকবেন। নবী (সা.) বলেছেন "যে কোরআন নিজে শিখে এবং অপরকে শিখায় সে হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।" আপনি নিজ সন্তানকে কোরআন পড়তে এবং বুঝতে শিখান, আপনি উম্মতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারার গৌরব অর্জন করতে পারবেন। পরিণতিতে তারা নিজেরা ভাল হয়ে চলবে, আপনার সন্তানদের সাথে পাড়া-প্রতিবেশীর আরও যত সন্তান হেদায়েতের দিকে আকৃষ্ট হবে আপনি তাঁদের সবার ছওয়াবে অটো শরীক হয়ে গেলেন। এতে করে এ কোরআন কেয়ামতে আপনার জন্য সুপারিশ করবে।

৬. কোরআনের হুকুম-আহকাম প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেকে যথাসম্ভব জড়িত করা

এ কাজকে আল্লাহ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, যেন আমরা তাঁর হুকুম মানতে চেষ্টা করি, যে হুকুম না মানলে ঈমান পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যাবার ভয় রয়েছে, যারা জমিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন, তাদেরকে যদি এমন ধমক আল্লাহ দিয়ে থাকেন, তাহলে সে তুলনায় আমরা তো কিছুই নই। যার ভয়াবহতা অনায়াসে অনুমেয়, যেমন দেখুন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমনকি নিজ বাপ-দাদা ও ভাই-বন্ধুদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না, যদি তারা ঈমান অপেক্ষা কুফরকে ভালবাসে। আর তোমাদের যারা তাদের অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা অবশ্যই সীমালঙ্ঘনকারী। বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের বাপ-দাদা, তোমাদের সন্তানাদি, তোমাদের ভাই-বন্ধু, তোমাদের পত্নীগণ, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের ঘর-বাড়ি যা তোমরা অধিক পছন্দ কর, এগুলো যখন আল্লাহ ও তাঁর রসুল এবং জিহাদ করা থেকে তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয়ে যাবে; তখন অপেক্ষা কর আল্লাহর বিধান বা ফয়সালা আসা পর্যন্ত, আর মনে রাখবে, আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (তাওবাহ: ২৩-২৪)।

অতএব কোরআনের হুকুম-আহকাম পালন করে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের কাজে আত্বনিয়োগ না করে কেহ রেহাই পাবে না। যিনি আপনার জীবন সৃষ্টি করলেন, তিনি আপনাকে পালন করার জন্য মাত্র একটি জব দিলেন, আর আপনি তা পালন না করে দিব্বি জীবন অতিবাহিত করছেন। কাজ সঠিকভাবে না করলে অফিসের জব থাকে না। যারা এ জব উৎসাহের সাথে পালন করবে অর্থাৎ জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর পথে মাল এবং জান দিয়ে প্রচেষ্টা চালাবে, তাদেরকে আল্লাহ জান্নাতের বিশাল নিয়ামতে ভূষিত করবেন।

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ اللَّهِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

"যারা ঈমান এনেছে, প্রয়োজনে দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড়ো মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর তারাই সফলকাম। তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের রব স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং সর্বোপরি জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য চিরস্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে আরও বাড়তি মহাপুরস্কার। (তাওবাহ: ২০-২২)।

অতএব ইউরোপ কিংবা পৃথিবীর যেকোন স্থানে থেকে এ মহান দাওয়াতি কাজে শরীক হতে না পারাটা কেবল দুর্ভাগ্যের বিষয়ই নয়, বরং এটি পরিষ্কার আল্লাহর হুকুমের নাফরমানির শামিল এবং মহানিয়ামত জান্নাত মিস করার একটি শয়তানি ষড়যন্ত্র। আল্লাহ আমাদের শয়তানের এ জাতীয় ফন্দি থেকে বাঁচার তাওফিক দিন।

৭. কোরআন বুঝার জন্য ইসলামী আন্দোলন জরুরি

অধ্যয়ন করে হিদায়াত লাভ করাই হচ্ছে কোরআনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুরা মুহাম্মাদের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে "এই কিতাব অধ্যয়ন করে বুঝার জন্যে আমরা পাঠিয়েছি, নাকি না বুঝার জন্যে মানুষের মনের উপর তালা লাগিয়ে দিয়েছি?" মূলত এ কিতাবখানা বুঝে পড়ার জন্যে একেবারেই উম্মুক্ত। যে কেউ যে কোন স্থান থেকে একটি কপি হাতে নিয়েই নির্দিধায় পড়া শুরু করে দিতে পারে। এ ভাবে যে তা অধ্যয়ন করবে সেই হিদায়াত পেয়ে

যাবে। দুনিয়াবী কোন ধান্ধায় পড়লে কিন্তু হেদায়েত পাওয়া যাবে না, চেষ্টার ফলে দুনিয়া হয়তো মিলে যেতে পারে; কিন্তু আখেরাতে সে ঠকবে। এ কিতাব বুঝার জন্য প্রাকটিক্যাল আরেকটি নিয়ম না মানলেই নয়, আর তা হলো, যে আন্দোলন পরিচালনা করতে কোরআনকে গাইড বুক হিসেবে পাঠানো হয়েছে, আপনাকে বাস্তবে সে আন্দোলনে শরীক হতে হবে, তখন জীবনের বাঁকে বাঁকে বাস্তব সমস্যার আলোকে আপনি কোরআনের আয়াত সমূহ বুঝতে সক্ষম হবেন। না হয় প্রকৃত পক্ষে আপনার কোরআন বুঝাও হবে না এবং তা মানাও হবে না।

৮. আল-কোরআন মান্যকারীরা আসলেই সফলকাম

যারা আল-কোরআন হিদায়াতের একমাত্র কিতাব হিসেবে ধরেছে, পড়েছে, মেনেছে, বাস্তবে আমল করে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছে, এমনকি এ জন্যে জীবন দিয়েছে, তাদের জীবনটি আসলেই সফল। তারা হবে মাওলার একান্ত অনুগ্রহে জান্নাতি মেহমান, তথায় তারা পাবে চির সুখ, মেহমানদারীর সব ব্যবস্থা তাদের জন্য করা আছে। এ কথার সাক্ষী সুরা কাছাছের ৫২-৫৫ আয়াত,

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ هُم بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

"আমি তাদের কাছে উপর্যুপরি বাণী পৌঁছিয়েছি। যাতে তারা অনুধাবন করে। কোরআনের পূর্বে আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছি, তারাও এতে বিশ্বাস করেছে। যখন তাদের কাছে এটা পাঠ করা হয়, তখন তারা বলে, আমরা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। এটা আমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে সত্য কিতাব। আমরা এর পূর্বেও আজ্ঞাবহ ছিলাম। তারা দুইবার পুরস্কৃত হবে তাদের সবরের কারণে। তারা মন্দের জওয়াবে ভাল করে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে।" (ক্বাসাস: ৫২-৫৪)

এই তিন আয়াতে আল্লাহ সুন্দর ভাবে বিবৃত করেছেন যে, "তারাই সফলকাম মানুষ। তারা নেয়ামত প্রাপ্ত হবে দুনিয়াতে এবং পরকালেও। তাদেরকে ধ্বংস করা হবে না। কেননা তারা সবসময় এর তিলাওয়াত করে, পড়ে এবং শিক্ষা গ্রহণ করে।" তারা আল্লাহর কালামের সব হুকুম অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে, তাদের দেশের লোকেরা জালিম হলেও তারা কোরআনের উপর মজবুতভাবে টিকে থাকে। তারা জালেমদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে আল্লাহর দ্বীনের ঝান্ডা বুলন্দ করার দুর্দান্ত শপথ নিয়ে এগিয়ে চলে। মহানিয়ামত জান্নাতের আশায় অটুট মনোবল নিয়ে তারা এর হারামকে হারাম জেনে ত্যাগ করে এবং হালালকে হালাল হিসেবে আমল করে এবং এর প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মজবুতভাবে এগিয়ে চলে।

৯. আল-কোরআন পরকালে আমাদের কাণ্ডারী:

আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বমহান। আর কোরআন সর্বশ্রেষ্ট কিতাব। মানুষ আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ মাখলুকাত। আল-কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য প্রদত্ত একমাত্র গাইডবুক। যে এ গাইড মেনে চলবে, সেই সফল এবং শ্রেষ্ঠ হবে। আর যে তা মানবে না, সেই বিফল। জানেন তো! আল-কোরআন আমাদের হাত ধরে পরকালে জান্নাতে পৌঁছাবে অথবা সেদিন আমাদের ভয়ানক বিপদে ফেলে দেবে। আমাদেরকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইচ্ছামত জীবন চালাতে আমরা বাধ্য। আমাদের নিজস্ব কোন চয়েস নেই। আল-কোরআন হচ্ছে আমাদের জীবন চলার গাইড বুক, তাই কোরআনের কথা মেনে চললেই আল্লাহ আমাদের সেদিন রেহাই দেবেন। আর কোরআনের কথামতে না চললে কোরআন আমাদের বাঁচাতে এগোবে না। এদিকে কোরআন না মানার কারণে নবীও আল্লাহর কাছে এ জাতীয় উম্মতের বিরুদ্ধে নালিশ দায়ের করবেন বলে সুরা ফুরক্বানের ৩০ নং আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

তাছাড়া আল্লাহ মানুষকে সতর্ক করে বলছেন, "হে মানুষ! তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের ঝাঁপি নিয়ে এগিয়ে চলেছ তোমাদের মালিকের দিকে, উপস্থিত হতে যাচ্ছ তাঁরই সম্মুখে। অতএব সাবধান!" (ইনশিক্বাক্ব: ৬)।

আর যদি আল-কোরআনকে কাণ্ডারী না মানেন এবং তা জীবনে অনুসরণ না করেন, তাহলে আল্লাহর জবরদস্ত হুশিয়ারী শুনুন। তিনি বলছেন, "তোমরা অনুসরণ কর, যা তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য সাথিদের অনুসরণ করো না। অতএব, আমি অবশ্যই তাদেরকে জিজ্ঞেস করব, যাদের কাছে রসূল প্রেরিত হয়েছিল এবং জিজ্ঞেস করব রসুলগণকেও।" (আ'রাফ: ৩-৬)

তিনি আরও বলেন, "এ কোরআন আপনার ও আপনার উম্মতের জন্যে প্রেরিত এবং শীঘ্রই আপনারা উভয়ই জিজ্ঞাসিত হবেন।" (যুখরুফ: ৪৪)।

অতএব আল্লাহ আমার রব, কোরআন আমার পথ, রসুল আমার পথ প্রদর্শক, তাই কোরআনের কথা মনে চলবোই।

উপসংহার:

আসুন! প্রতিদিন যেমন ঘরের বিড়ালকে কিংবা ছোট ছোট বাচ্চাদের মুখে খাবার উঠিয়ে দিতে হয়। ফুলের টবে যেভাবে প্রতিদিন পানি দিতে হয়, এভাবে ঘরের কোরআনের কপিটিকেও প্রতিদিন সম্মান করি, খুব যত্ন সহকারে সামান্য হলেও অর্থসহ পড়ি। ছওয়াবের তীব্র আশায় তিলাওয়াত করি, আমলের উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করি, হালাল অর্জন এবং হারাম বর্জনে কোরআনের হুকুম মেনে চলি। নামাজ-রোজাসহ দৈনন্দিন কাজ-কর্মে ইতিবাচক হুকুমগুলো যথাযথভাবে পালন করি, পুরাতন এবং মডার্ন জাহিলিয়াতকে (বেপর্দাসহ) মানতে অস্বীকার করি। তাহলেই আশা করা যায় আল্লাহ আমাদেরকে পরকালের কঠিন এবং ভয়াবহ আজাব থেকে রেহাই দেবেন এবং জান্নাতের অনন্ত নিয়ামাতে সিক্ত করবেন। সুতরাং সকল মুসলিম ভাই-বোনের কাছে আন্তরিক আবেদন! আসুন, দুনিয়াতে কোরআন ধরুন, কোরআন পড়ুন, কোরআন বুঝুন, কোরআন মেনে চলুন, বেঁচে যাবেন। পরিবারসহ উম্মাহকে বাঁচাতে সাহায্য করুন। আল্লাহ আমাদের মঙ্গল করবেন, ক্ষমা করে জান্নাত দেবেন ইনশাআল্লাহ।

লেখক: দাওয়া সেক্রেটারী এম সি এ
ইমাম: ইস্ট লন্ডন মসজিদ ।

মানুষের জন্য দ্বীনের দাওয়াত

মোসলেহ ফারাদী

মানুষ আল্লাহর প্রতিনিধি (২:৩০)। প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে হবে তা দেখানোর জন্যই আল্লাহ তায়ালা কিতাব ও কিতাবের বাহক নবী ও রসুলদেরকে পাঠিয়েছেন। শেষ রসুল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর প্রেরিত কিতাব কোরআন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন যে, "কোরআন মানুষের জন্য হেদায়াত, হেদায়াতের সুস্পষ্ট দলিল এবং সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড।" (২:৮৫)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, "আপনাকে আমরা মানুষের জন্য রসুল করে পাঠিয়েছি এবং এ ব্যাপারে আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট।" (৪:৭৯)। অতঃপর এ দায়িত্বগ্রহণ করে তিনি ঘোষণা দিয়েছেন "হে মানুষ আমি তোমাদের সবার উপর আল্লাহর রসুল।" (৭:১৫৮) আর মুসলিম উম্মাহকেও আল্লাহ তায়ালা সমগ্র মানবজাতির দায়িত্ব দিয়েছেন "তোমরা সর্বোত্তম জাতি, মানুষের জন্যই তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।" (৩:১১০) সুতরাং মানব কল্যাণই কিতাব ও তারই প্রেরণের উদ্দেশ্য। এ কল্যাণই হবে উভয় জগতের লাভ এবং তা আল্লাহর হুকুম ও রসুলের আদর্শের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

মানুষ পরিবর্তনশীল। মানুষ শারীরিক ভাবে পরিবর্তিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা কোরআনে উল্লেখ করেছেন "আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন দুর্বল করে, তারপর তোমাদেরকে শক্তিশালী করেন। পুনরায় তোমাদের দুর্বল করে বার্ধক্যে উপনীত করেন।" (৩০:৫৪) পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের প্রয়োজনে যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি মানুষের উপর আল্লাহর হুকুম আহকামও পরিবর্তন হয়। উদাহরণ: একজন নিষ্পাপ শিশু বালেগ হওয়ার সাথে সাথে সে শরয়ী হুকুম আহকামের আওতায় চলে আসে। তেমনি একজন বৃদ্ধের বেলায়ও শরীয়ত পালনে অনেক ছাড় দেওয়া হয়। মূলতঃ প্রতিটি ব্যক্তির অবস্থা অনুযায়ীই তার উপর দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং তার অবস্থার আলোকেই আখেরাতে তার সওয়াল জওয়াব হবে। কাজেই জীবন যেমন বৈচিত্র্যময় তেমনি দাওয়াতও হবে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

মূল দাওয়াত ও তার শাখা প্রশাখা

তবে মানুষের জীবনের প্রয়োজনে দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও দাওয়াত দানের পদ্ধতি নির্ধারিত হলেও দাওয়াতের মৌলিক বিষয় কখনও উপেক্ষিত হতে পারবে না। উপস্থাপনায় পরিবর্তন আনা হলেও হয়তো তা জরুরিই হবে কিন্তু মূল বিষয় তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতকে কখনই উপেক্ষা করা যাবে না। এ বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করলে দাওয়াত আর দ্বীনি দাওয়াত থাকবে না। কোন সংগঠন যদি এ বিষয়গুলো উপেক্ষা করে তাহলে তা আর দ্বীনি সংগঠন থাকবে না। অতীতের সমস্ত জাতির নিকট আল্লাহ তায়ালা রসুল পাঠিয়েছেন এবং তারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও তাগুতের অস্বীকার করার জন্য (১৬:৩৬) এবং এ দাওয়াত দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছেন যে মানুষ যেন আখেরাতের উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করে (২:৪)। কাজেই তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতই দ্বীনি দাওয়াতের মূল উদ্দেশ্য। যার ফলশ্রুতিতে মানুষ যেন দুনিয়ায় সুন্দর জীবন-যাপন ও আখেরাত জান্নাত লাভ করতে পারে।

এ মৌলিক বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে দাওয়াতের শাখা প্রশাখাও সাজাতে হবে। প্রধান দুটি শাখা হচ্ছে মুসলিম দাওয়াত এবং অমুসলিম দাওয়াত। উভয় শাখায় কিছু মৌলিক বিষয় এবং কিছু সহকারী বিষয় সাব্যস্ত হবে। এ ক্ষেত্রে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে দাওয়াতের বিষয়বস্তু, ধরণ ও অগ্রাধিকার নির্ধারিত হবে। যা করার জন্য, সর্বপ্রথম যাদের কাছে দাওয়াত পৌছানো হবে সে মানুষগুলোর জীবন, সমাজ ও চরিত্রের পর্যালোচনা হতে হবে। তাদের অবস্থার পেছনে কি কারণ বিদ্যমান। কোনটি মূল কারণ আর কোনটি পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তা নির্ধারণ করতে হবে। অতঃপর নির্ণয় করতে হবে কিভাবে বর্তমান অবস্থা থেকে ধাপে ধাপে মানুষ বা মানুষগুলোকে আকাঙ্ক্ষিত অবস্থানে ফিরিয়ে নেওয়া যায়।

মুসলিম দাওয়াত: পেক্ষাপট

মুসলিম, যারা অমুসলিম সংখ্যাগুরু দেশে সংখ্যালঘু হিসেবে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন তাদের জীবন ধারা মুসলিম সংখ্যা গুরুদেশে

বসবাসকারী মুসলিমদের চেয়ে ভিন্নতর। যদিও ইন্টারনেটের কারণে মানুষের জীবনে দ্রুততম পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং সারা দুনিয়ার মানুষের চিন্তা ধারা ও জীবন ধারা একাকার হয়ে যাচ্ছে তবুও সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে সংখ্যাগুরুর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়াও ভার্চুয়াল জগত ও বাস্তব জগতের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রতিদিন স্ব-শরীরে যাদের সাথে বসবাস করা হয় তাদের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সহজ নয়।

মূলত এখানে আমাদের মুসলিম পরিচয়ই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়ে দাড়িয়েছে। যার বয়স যত কম তার চ্যালেঞ্জ তত কঠিন। আর সর্বোচ্চ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে এখানে জন্ম গ্রহণকারী আমাদের সন্তানরা। ঘরে বাইরে দুটি সংস্কৃতির মধ্যে বসবাস, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে পরস্পর বিরোধী জ্ঞান অর্জন এবং তাদের ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষার যাতাকলে পিষ্ট হয়ে অনেকেই দিশেহারা হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং বাস্তবতার আলোকে প্রথম প্রজন্ম ও নতুন প্রজন্মের দাওয়াতের লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও পদ্ধতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য সূচিত হবে। অভিজ্ঞতা এটাই বলে যে, এখানে বড়ো হওয়া ছেলে-মেয়েদের বাংলা এতটুকু পর্যায়ে পৌঁছে না যা দিয়ে তারা কোন চিন্তাধারা আয়ত্ত করতে পারে। তাওহীদ, রেসালাত ও আখেরাতের মত ধারণাগুলো বাংলায় পড়ে বুঝতে হলে যে পর্যায়ের বাংলা প্রয়োজন তা সচরাচর অর্জিত হয় না।

এছাড়াও যে পদ্ধতিতে ইউরোপের ছেলে-মেয়েরা শেখে অভ্যস্ত সে পদ্ধতি ছাড়া তারা মনোনিবেশ করতে পারে না। অনেক সময় তারা বিরক্তিতে জ্বলতে থাকে কিন্তু সম্মান-শ্রদ্ধার কারণে প্রকাশ করে না। যখনই তারা বড়ো হয় এবং স্বাধীন হয় তখন আর তাদেরকে পাওয়া যায় না। ভাষা ও পদ্ধতির জটিলতার কারণে অনেকদিন সাথে থাকার পরও তাদের চিন্তাধারা কাঙ্ক্ষিতভাবে তৈরি হয় না। কাজেই দুপ্রজন্মের দাওয়াত দুটি ধারায় চলতে হবে। কিন্তু প্রথম প্রজন্মেরই দুটি ধারার জন্ম দিতে হবে। কারণ নতুন প্রজন্মের এখনও দেওয়ার কিছু নেই। দায়ভার প্রথম প্রজন্মের উপরই পড়ে যদিও সময়োপযোগী যোগ্যতা ও ভাষার দৈন্যতা আছে এবং আছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক দায়দায়িত্ব। তবুও সন্তানদের পথ হারার আশঙ্কা ও আল্লাহর কাছে জওয়াবদিহির ভয়ের কারণে তাদেরকে আস সাবিকুন আল আউয়ালুনের ভূমিকা পালন করতে হবে।

অমুসলিম দাওয়াত: প্রেক্ষাপট

পাশ্চাত্যে ইসলামের ভবিষ্যত নির্ভর করে স্থানীয় আধিবাসীদের উপর। ইসলাম সম্পর্কে তাদের ইতিবাচক ধারণা, ইসলামকে বরদাস্ত করার মানসিকতা এবং সর্বোপরী একটি বিরাট সংখ্যকের ইসলাম গ্রহণ করার উপর। আল্লাহ তায়ালা যদি কোন অসাধারণ অবস্থা সৃষ্টি না করেন তাহলে স্বাভাবিক অবস্থায় মুসলমানদের পাশ্চাত্যে সংখ্যাগুরু হওয়া সুদূর পরাহত। কিন্তু আমরা ঈমাম মাহদীর আগমনে বিশ্বাস করি, ইসা (আ.) এর পুনরায় আগমনের ওপর ইয়াকিন রাখি এবং সারা দুনিয়াবাসীর আল্লাহকে গ্রহণ করে নেওয়ার ভবিষ্যতবাণীতে আস্থা রাখি। এটাও স্বীকার করি যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের উপর দাওয়াতে দ্বীনের জিম্মাদারী দিয়েছেন এবং শুধু অর্থনৈতিক কারণে তিনি আমাদেরকে পাশ্চাত্য জায়গা দেননি। এটাও আমরা মনে করি যে, আমাদের রেখে যাওয়া সন্তাদের ভবিষ্যত ঈমান ও ইসলাম নির্ভর করে আমাদের দাওয়াতের উপর। কাজেই অমুসলিম দাওয়াতকে যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে।

দেশে যে অমুসলিমদের সাথে আমাদের উঠাবসা ছিলো তাদের সাথে আমাদের ভাষার একতা, অনেক সাংস্কৃতিক মিল ও ইতিহাস ঐতিহ্যের সামঞ্জস্য ছিলো। কিন্তু পাশ্চাত্যের অমুসলিমদের সাথে তা নেই। কাজেই এখানে অমুসলিম দাওয়াতের প্রথম কাজ হচ্ছে জানা। এখানকার মানুষ, তাদের চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সাংস্কৃতি ও আকিদা-বিশ্বাস সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা। অতঃপর তাদের উপযোগী দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও পদ্ধতি নির্ধারণ করা। যদি ও পাশ্চাত্যকে খ্রিষ্ট ধর্মালম্বী মনে করা হয় কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা, উদার নৈতিকতা, বস্তুবাদ ও নাস্তিক্যবাদ সমাজ পরিচালনার মূলমন্ত্রে পরিণত হয়েছে। কে কোন চিন্তাধারা নিয়ে আছে তা সাব্যস্ত করা এক কঠিন কাজ। সব অবস্থা সামনে রেখে কিভাবে দাওয়াতী কাজকে সহজভাবে উপস্থাপন করা যায় সে গবেষণা করতে হবে। হয়ত একটি সহজ পদ্ধতি সকল মানসিকতার জন্য কার্যকর হবে।

মুসলিম চরিত্র

একজন মুসলিমের চরিত্র যে প্রভাব বিস্তার করে তার তুলনা অন্য কিছুর সাথে হয় না। ইসলাম ও মুসলমানদের সম্পর্কে প্রতিনিয়ত যে মিডিয়া আক্রমণ চলছে তার জবাব মুসলিমরা চরিত্র মাধুর্যের মাধ্যমে সফলভাবে দিতে পারে। একজন মুসলিমের আচার ব্যবহার বলে দেবে যে অপপ্রচারগুলো মিথ্যা। এজন্য মুসলিমদেরকে উন্নত চরিত্র নিয়ে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সাথে মিশতে হবে। একজন মুসলিমের জীবন পড়ে পড়ে একজন অমুসলিম ইসলাম শিখে নেবে। হয়ত একদিন আল্লাহ তায়ালা তাকে হেদায়েত দান করবেন।

মুসলিমের ইখলাস

দাওয়াতী কাজে সফলতা নির্ভর করে মুসলিমের ইখলাসের উপর। সফলতাতো তখনই হবে যখন পরকালে তার ভালো কাজের পাল্লাভারী হবে যা ইখলাসের উপর নির্ভরশীল। মুসলিম বিশ্বাস করবে সে সফলতা যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল নয়। এমন কি রসুল (সা.) কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন "ভালোবাসার লোককেও আপনি পথে আনতে পারবেন না। কারণ আল্লাহই যাকে চান পথে নিয়ে আসেন। কে সৎপথে আসবে তা তিনিই ভালো জানেন।" (২৮:৫৬)।

আল্লাহর দেওয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানোর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টির লাভের আশাই প্রকৃত সফলতা। আল্লাহ তায়ালার পরিকল্পনা তিনিই বাস্তবায়ন করবেন। তিনিই সর্বজ্ঞানী ও সর্বশক্তিমান। আমাদের কাজ হবে সাধ্যমত বুদ্ধি-বিবেক খরচ করে কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখা।

কেন্দ্রীয় সভাপতি: মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

নাগরিক অংশগ্রহণঃ একটি উন্নত সমাজের সোপান

ড. মুহাম্মাদ আব্দুল বারী

আমাদের চিরচেনা পৃথিবী সাম্প্রতিক সময়ে নানামুখী চ্যালেঞ্জের পাশাপাশি বহুমাত্রিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। গণস্বাস্থ্য ও **আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে** করোনা মহামারী যে প্রকট সংকট তৈরি করেছে তার রেশ এখনো কাটেনি। এ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে দেড় কোটি মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। মৃতের সংখ্যা এখনো নিয়মিতভাবে বেড়ে যাচ্ছে। করোনার কারণে সমাজে বৈষম্য ও অসমতা যেন নতুন মাত্রা লাভ করেছে। ধনী গরীবের সম্পদের ব্যবধান অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাজ্যের মোট সম্পদের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা রয়েছে মাত্র ১ শতাংশ মানুষের হাতে। ২০২১ সালে ফোর্বস এর বার্ষিক বিলিওনারের তালিকায় রেকর্ড সংখ্যক ২,৭৫৫ জন বিলিওনারের নাম পাওয়া গেছে। তাদের কাছে মোট ১৩.১ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ রয়েছে, এক বছর আগেও যা ছিল ৮ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।

পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের সংকটও বিগত কয়েক দশক জুড়ে গোটা বিশ্ববাসীকে ভোগাচ্ছে। বৈজ্ঞানিকরা সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, পৃথিবীকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য বসবাসের উপযোগী রাখতে হলে ২১০০ সালের মধ্যে বৈশ্বিক উষ্ণতাকে যেকোনো ভাবে ১.৫ সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতেই হবে। একই দৃষ্টিভঙ্গি গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সর্বশেষ জলবায়ু সম্মেলনেও প্রতিফলিত হয়েছে। এই দুটো প্রকট সংকটের বাইরে, ইউরোপে আবারও যুদ্ধের প্রত্যাবর্তন হয়েছে ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের মাধ্যমে। এ যুদ্ধের বদৌলতে আবারও পৃথিবী নতুন করে মৃত্যু, ধ্বংস আর অগনিত বেসামরিক নাগরিকদের বাস্তুচ্যুতি প্রত্যক্ষ করছে।

প্রতিকূল সময়ে অপরকে সহযোগিতা:

জনগনের কল্যাণে কাজ করার দায়বদ্ধতা প্রতিটি সরকারেরই রয়েছে। ধনী ও গরিবের বৈষম্য দূরীকরণেও এর কোনো বিকল্প নেই। যদিও অনেক রাজনীতিবীদই এই প্রাথমিক কাজটা করতেও এখন ব্যর্থ হচ্ছেন। উন্নত গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে অন্তত কথা বলা এবং ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণ এখনো কিছুটা সুবিধা ভোগ করছে। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলো, যার অধিকাংশই এখন স্বৈরাচারী শাসক বা গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে কর্তৃত্বপরায়ণ শাসকের অধীনে রয়েছে, সেখানে জনগণ অনেক বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছে এবং শাসকদের মাধ্যমেও অনেকটা কোনঠাসা হয়ে আছে।

প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব হলো নিজেদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন থাকা, আর্থ-সামাজিকভাবে সতর্ক হওয়া এবং নিজেদের অধিকার পূরণে সক্রিয় থাকা। সমাজে ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত হলে এবং সকলের জন্য সমান সুবিধা নিশ্চিত করা গেলে মানুষ অর্থবহ **স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। তবে, এই সুবিচার ও** সামাজিক সমতা ত্যাগ **স্বীকার না করে কিংবা** কষ্ট না করে পাওয়া যায় না। ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, মানুষকে বরাবরই তার অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম করতে হয়েছে।

প্রতিটি দেশের উন্নয়নের জন্য জনগনের শক্তির উত্থান অপরিহার্য। উন্নত বা উন্নয়নশীল, সবদেশেই নাগরিকদেরকে নিশ্চিত করতে হবে যে

১. **স্থানীয় জনগোষ্ঠীর** কার্যক্রমে তারা সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত হবে যাতে সমাজটি বিকশিত হয় এবং সকলের জন্য উপযোগী একটি সমাজ বিনির্মাণ করা সম্ভব হয়

২. জনগনকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ জনগনের সেবকদের ওপর সবসময় নজর রাখতে হবে। যদি নেতারা জনগণের প্রত্যাশিত সেবা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে নেতাদেরকে জবাবদিহির আওতায় আনার জন্যেও জনগণকে প্রয়াস চালাতে হবে।

পেশা, ধর্ম, গোত্র, জাতীয়তা **প্রভৃতির আলোকে মানুষের** অনেকগুলো পরিচয় হতে পারে। যে সমাজ নানা পরিচয়ের সব মানুষকে একসাথে ধারণ করতে পারে সেখানেই ইতিবাচক মূল্যবোধের চাষাবাদ হয় এবং জাতীয় অগ্রগতিও সুনিশ্চিত হয়। এর প্রমাণ সাম্প্রতিক করোনা অতিমারীতে আমরা পেয়েছি কারণ সেই সময়ে একদম সাধারণ মানুষকেও মানবতার কল্যাণে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে দেখা গেছে।

সফল সমাজের বৈশিষ্ট্য:

সফল সমাজ মানেই অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ, যেখানে বহুমাত্রিক ও বহু পরিচয়ের লোকজন একসাথে বাস করে। এমন একটি সমাজ যেখানে আইনসম্মতভাবেই সকল নাগরিকের জন্য একই ধরনের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত **করা হয়। সফল সমাজ সবার জন্যই উন্মুক্ত হয়;** সেখানে সবাই একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকে।

সফল সমাজ কাঠামোর **প্রথম উপকরণটি** হলো পারিবারিক মূল্যবোধ। যুব প্রজন্মকে অবশ্যই নৈতিকসম্মতভাবে বড়ো করতে হবে। সন্তানদেরকে পরিবারের মাঝে রেখে সামাজিক একটি জীবন-যাপনের সুযোগ দেওয়া কিংবা তাদেরকে ভালো মানের শিক্ষা প্রদান করা, সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা কিংবা ইতিবাচক চরিত্র গঠন করার মতো কাজগুলোর দায় শুধু পিতামাতার ওপরই নয় বরং গোটা সমাজের ওপরই বর্তায়।

দ্বিতীয় উপকরণটি হলো সমাজের দরিদ্র ও অসহায় মানুষগুলোর প্রতি বাড়তি যত্ন নেওয়া। এই বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য বিশ্বাসের লালন করা জরুরি। যদি কোনো সমাজে বয়স্ক লোকদের কেয়ার হোমসে বা বৃদ্ধ নিবাসে রাখা হয় কিংবা তারা যদি সন্তানদের কাছে অবহেলিত হন, তাহলে সেই সমাজের অবস্থা খুবই শোচনীয় বলেই প্রতীয়মান হয়। বয়স্ক লোকেরা যেহেতু এক জীবনে আমাদের জন্যই কষ্ট করেছেন তাই তাদের সম্মান নিশ্চিত করা গেলে ভবিষ্যতে যারা বৃদ্ধ হবেন তাদেরও সম্মান পাওয়ার পথ খুলে যায়।

সফল সমাজের **তৃতীয় মানদণ্ডটি** হলো এই সমাজে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থদের যত্ন নেওয়া হবে। তাদেরকে সাধ্যের মধ্যে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে যুক্তরাজ্য তার এনএইচএস সেবার কল্যাণে অনেক উন্নত দেশের তুলনায় এগিয়ে আছে। তবে, যে কোনো গণমুখী সেবাকে কার্যকর রাখতে হলে চাই প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা এবং নিরবিচ্ছিন্ন রাজনৈতিক সমর্থন।

সফল সমাজের **চতুর্থ বৈশিষ্ট্য** হলো এখানে পরিবেশকে সুরক্ষা করা হবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতা মোকাবেলায় তৎপরতা চলমান থাকবে। ইসলাম আমাদের শেখায় যে, মানুষ এই পৃথিবীতে খলিফা হিসেবে এসেছে। খলিফা শুধু সম্মানজনক উপাধি নয়, বরং দায়িত্ববোধেরও বিষয়। তাই সকল মানুষকে বিশেষ করে নেতৃবৃন্দকে নিজেদের অবস্থানের আলোকে পরিবেশের সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

৫ম বৈশিষ্ট্য হলো সামাজিক ও জনজীবনে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুশীলন বৃদ্ধি করা। বাইবেল যেমন প্রতিবেশিদের যত্ন নিতে বলে, ইসলামও মুসলিমদের একই শিক্ষা দেয়। মানব সমাজে বর্তমানে এত বেশি সংকটের জন্ম হচ্ছে শুধুমাত্র স্বার্থপরতা ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক চিন্তাধারার কারণেই। পাশাপাশি, নানা রকমের ভয় ও আতঙ্ক, অজ্ঞতা ও মানুষকে অবমূল্যায়নের কারণে সমাজের শান্তি ও ভারসাম্য অনেকটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মুসলিমদের জন্য চ্যালেঞ্জসমূহ:

মুসলিমরা এখন অনেকক্ষেত্রেই পিছিয়ে আছে। নিজেদের দেশের শাসন ক্ষমতা কিংবা নাগরিক দায়িত্ব, কোনোটাই বর্তমানে তাদের হাতে নেই। রাজনীতির হিসেব কষলে গোটা মুসলিম বিশ্বজুড়ে একটি হতাশাজনক ছবিই যেন ভেসে ওঠে। অনেক মুসলিম দেশই স্বৈরাচারী শাসক দ্বারা শাসিত হচ্ছে আর সেখানকার সুশীল সমাজও **ভঙ্গুর অবস্থায় পড়ে আছে। ঔপনিবেসিকতা থেকে মুক্তি পাওয়া মুসলিম** সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ কিংবা পশ্চিমের মুসলিম সংখ্যালঘু দেশ, সবখানেই এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন হলো জনসেবার সংস্কৃতি গড়ে তোলার মাধ্যমে একটি উন্নত সমাজ কাঠামো বিনির্মাণে চেষ্টা করা। পাশাপাশি, নৈতিকবোধ সম্পন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের উত্থানও কাম্য। আমাদের প্রচুর পরিমাণ সমাজসেবক প্রয়োজন যারা মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত থাকবে।

একইসাথে মুসলিম প্রতিষ্ঠান, সংস্থা ও মসজিদগুলো উচিত সবাইকে নিয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে একটি মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। দান-সাদাকায় মুসলিমদের যে সক্রিয় ভূমিকা তার ওপর ভিত্তি করেও জন সম্পৃক্ততা ও জনসেবামূলক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি করা উচিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বৃটেনসহ অনেক দেশেই নাইন-এলিভেন পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের সাদামাটা নাগরিক কর্মকাণ্ডকেও নেতিবাচকভাবে চিত্রায়িত করার অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত অনাস্থা ও অবিশ্বাস যেন আমাদের কাউকেই সৎ ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে না পারে সেই প্রচেষ্টাও সবসময় অব্যহত থাকা উচিত।

বই পাঠ ও প্রজন্মকে উৎসাহত করা

৮ম শতকে মুসলিমদের উত্থান শুরু হয়ে পরবর্তী ৬শ বছর পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। মুসলিমদের এই উত্থানের নেপথ্যে ছিল পড়াশুনার প্রতি তাদের অদম্য আকর্ষণ। তৎকালীন সময়ে মুসলিমরা জ্ঞানের জগতে সক্রিয় পদচারণা চালিয়েছিল। তখনো পর্যন্ত বই হাতেই লিখতে ও কপি করতে হতো। অথচ সেই কঠিন সময়েও মুসলিমরা নানাস্থানে বিশেষ করে মসজিদ ও শিক্ষাকেন্দ্রের পাশে পাঠাগার স্থাপন করেছিল। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিখাতে মুসলিমদের উন্নতি ও একের পর এক আবিষ্কার ও জ্ঞানের বৈপ্লবিক উত্থানের কারণে মুসলিমরা তখন বিজ্ঞান, চিত্রকলা, চিকিৎসা ও দর্শনসহ সব ক্ষেত্রে যুগান্তকারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়। মুসলিমদের এই জ্ঞানের ওপর ভর করেই পরবর্তীতে পশ্চিমা ইউরোপে রেনেসাঁ ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব সংঘটিত হয়।

পরিতাপের বিষয় হলো, ইউরোপীয়ানরা জ্ঞানের সন্ধান পাওয়ার পর নতুন শক্তিতে বলিয়ান হয়ে যখন এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন সাহসিকতার অভাব, রাজনৈতিক দুর্বলতা আর বিভেদ-বিভাজনের জেরে মুসলিম বিশ্ব ক্রমান্বয়ে দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ছিল। মঙ্গলদের অতর্কিত আক্রমণ মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়। অগনিত জ্ঞান ও পাঠ কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যায়। শতশত বুদ্ধিজীবীকে

হত্যা করা হয়। এই মঙ্গলদের অনেকেই পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করে। এর কয়েক বছর পর অটোম্যানদেরও উত্থান হয়। এরপরও মুসলিমরা তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকলাঙ্গতা আর সামাজিক-রাজনৈতিক অচলায়তন থেকে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি।

বর্তমানে মুসলিমদের সার্বিক অবস্থান ভীষণই নৈরাজ্যকর। রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব অনেকটাই ক্ষয়িষ্ণু। সুশাসন নেই বললেই চলে। মানব সম্পদ ও প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতাও কমে এসেছে। নাইন-এলিভেন পরবর্তী সময়ে মুসলিমদের অনেক ঐতিহাসিক ভূখণ্ডেই যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর মুসলিম দেশগুলোর রাজনৈতিক ব্যর্থতাও এখন অনিবার্য বাস্তবতা। মুসলিমদের সোনালী যুগের প্রত্যাবর্তনে হয়তো আরো কিছুটা সময় লাগবে। তবে, আপাতত মুসলিমদের উচিত পরবর্তী প্রজন্মকে, তাদের চিন্তাধারাকে ভালোভাবে গড়ে তোলা। তাদের মাঝে বই পড়ার অভ্যাস ছড়িয়ে দেওয়া এবং চরিত্র সংশোধন করা। তৃণমূল নেতৃত্বকে সামনে নিয়ে আসা উচিত। বাড়িতে পিতামাতাকে, স্কুলে শিক্ষকদেরকে এবং মসজিদে ইমামদের সক্রিয় করা উচিত এবং জনসেবামূলক কাজেও তাদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন।

নাগরিক শক্তি সংহত করা:

সমঝদার মুসলিমরা তাদের দুটো প্রধান দায়িত্ব সম্পর্কে বরাবরই সচেতন থাকে। একটি হলো তাদের স্বজাতি তথা কওমের প্রতি দায়িত্ব পালন আর আরেকটি হলো উম্মাহর প্রতি দায়িত্ব পালন। এই দুটো দায়িত্ব আবার পরস্পরের পরিপূরক। নানা চ্যালেঞ্জ থাকা সত্ত্বেও বৃটেনে আমাদের সুশীল সমাজ এখন অনেকটাই সক্রিয় ও কার্যকর। নানামুখী জনকল্যাণমূলক কাজে মুসলিমদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এখন দেখার বিষয় আমরা তৃণমূলের কতটা গভীরে এই জনসম্পৃক্ত মানসিকতা প্রবেশ করাতে পারি এবং অন্যদের সাথেও কতটা ইনসাফ করতে পারি। সোনালী যুগে মুসলিমরা অনেকটা ধর্মীয় ও সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই অপরের সেবা করতো। মুসলিমদের এই অসাধারণ মানসিকতার কারণেই নানা চিন্তাধারার মানুষের মাঝে সম্পর্কও তৈরি হয়েছিল।

বর্তমান সময়ে যেভাবে ব্যক্তিতন্ত্রবাদ, ভোগবাদ আর দম্ভ বেড়ে চলেছে, তার মোকাবেলায় মানবিক, সহানুভূতিশীল ও যোগ্য নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশি পরিলক্ষিত হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে, জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সেবামুখী মুসলিমদের এখন খুব বেশি প্রয়োজন। নেতার **প্রাথমিক দায়িত্ব জনগনের সেবা করা,** এ কথাটি কথা ও কাজে আমাদের রসুল (সা.) **প্রমাণ করে গেছেন। সেবামুখী নেতৃত্ব মানেই হলো, নেতৃত্বের পদের সুবিধা** না নেওয়া, বিনয়ী হওয়া এবং কোনো রকমের আনুকূল্য পাওয়ার লোভে নয় বরং স্বতস্ফূর্তভাবে সমাজের অভাবী মানুষগুলোকে সাহায্য করা। এই মানসিকতা নিয়ে নেতৃত্ব দিতে পারলে অনেক দুনিয়াবি সমস্যার যেমন সমাধান হয় তেমনি আধ্যাত্মিক পুরস্কারও লাভ করা যায়। একটি জাতি তখনই নিজের পায়ে দাঁড়ায় যখন সেখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সৎ রাজনৈতিক নেতৃত্ব থাকে, সুশীল সমাজও সক্রিয় থাকে এবং ধর্মীয় নেতারাও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তৎপর থাকে।

উপসংহার:

সমাজের সিংহভাগ মানুষ যদি ভালোও হয় তারপরও নাগরিক দায়িত্ববোধের চর্চা না থাকলে সেই সমাজে অনাচার বাড়তেই থাকে। পরিবর্তন এমনিতেই আসে না। পরিবর্তনের জন্য সচেতন নাগরিকদেরকে সক্রিয় হতে হয়, কণ্ঠ উচ্চকিত করতে হয়। মূলধারার মিডিয়ার ওপরও সামাজিকভাবে চাপ সৃষ্টি করতে হয় যাতে তারা সঠিক তথ্য সরবরাহ করে, কোনো ব্যক্তি, রাজনৈতিক দলকে অন্ধভাবে সমর্থন না করে। একটি সমাজের সফল হওয়ার প্রধান উপায় হলো এর বহুমাত্রিকতা। সমাজে ভয়, কুসংস্কার কিংবা বর্ণবিদ্বেষের লক্ষণ দেখা দিলে তাৎক্ষনিকভাবে তা প্রতিহত করতে হবে। সমাজ ও প্রশাসনের তরফ থেকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব হলো সমন্বিত অবস্থান নেওয়ার মধ্য দিয়ে সর্বস্তরে সমতাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সমাজের প্রতিটি খাতে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজকে উন্নত করার চেষ্টা আমাদের চালাতে হবে। অপরের সুখ দুঃখের সাথি হতে হবে। সাধ্যানুযায়ী অপরকে সাহায্য করতে হবে। সক্রিয় ও সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন,

"সৎকর্ম ও খোদাভীতিতে একে অন্যের সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যের সহায়তা করো না।" **(সুরা আল মায়েদাহ: ২)**

লেখক: শিক্ষাবীদ, প্যারেন্টিং বিশেষজ্ঞ এবং লেখক।
সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল, মুসলিম কাউন্সিল অফ ব্রিটেন।

ইসলামী দাওয়াতের পদ্ধতি

প্রফেসর ডঃ মোঃ আবুল কালাম পাটওয়ারী

ইসলামী দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ যে পদ্ধতি ও পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, আমাদেরকেও সে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। অতঃপর রাসূল সা. তার জীবনে দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন সে সব পদ্ধতির মাধ্যমে দাওয়াতের কাজ করতে হবে।

প্রথমত ঃ একজন রোগীর রোগ নির্ণয় করতে হবে তারপর ঔষধ দিতে হবে। শত্রুর উপর আক্রমণ করার পূর্বে পরিকল্পনা ঠিক করতে হবে। তীর নিক্ষেপ করার পূর্বে লক্ষ্য নিধারণ করতে হবে। কোন একটি পথ বন্ধ হলে অন্য পথ খুঁজতে হবে। যত বিপদ আসুক না কেন লক্ষে¨ না পৌঁছা পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, আল্লাহ বলেন :

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ.﴾

"তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্যে থেকে একজন রাসুল এসেছেন তোমাদরে দুঃখ কষ্ট তার পক্ষে দূঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী মুমিনদের প্রতি স্নেহশীল, দয়াবান"। (সূরা তাওবা ঃ ১২৮)

দাওয়াতের ক্ষেত্রে লক্ষ্য থাকবে কোন পদ্ধতিতে মানুষের অন্তর আকৃষ্ট করা যায়, এবং কিভাবে তাদের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা যায়। পবিত্র কুরআনে দাওয়াতের পদ্ধতি সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

"আল্লাহর পথে হিকমত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহ্বান করুন, এবং পছন্দ ও উত্তম পন্থায় তাদের সাথে বিতর্ক করুন। নিশ্চয়ই আপনার রব পথভ্রষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কে অধিক জ্ঞান রাখেন এবং যারা সঠিক পথে তাদেরকেও তিনি ভাল করে জানেন"। (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

হিকমতের অর্থ ঃ

১। حكمة অর্থ বুদ্ধি ও জ্ঞান দ্বারা সত্যকে বের করা।

২। حكمة অর্থ কুরআনের জ্ঞান।

৩। حكمة শরিয়তের আহকামের সাথে সাথে সামঞ্জস্যশীল বুদ্ধিবৃত্তিক দলীল।

কুরআনে হিকমত শব্দটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছেঃ

﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ ওয়াজ ঃ

"যে কেতাব ও জ্ঞানের কথা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে তা দ্বারা তোমাদেরকে উপদেশ দান করা হয়"। (সূরা বাকারা ঃ ২৩১)

জ্ঞান ও হৃদয়ঙ্গম ঃ ﴿ واتينا لقمان الحكمة﴾ আমি লোকমানকে প্রজ্ঞা দান করেছি।

আন-নুবুয়া ঃ ﴿آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾"আমি ইব্রাহীমকে কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছি, অর্থাৎ নবুওয়ত"। (সূরা নেসা ঃ ৫৮)

গোপন রহস্য ঃ ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾ "তোমরা হিকমতের সাহায্যে তোমাদের রবের দিকে আহ্বান কর"। (সূরা নাহল ঃ ১২৫)

৪। হিকমত কল্যাণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ঃ ﴿وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا﴾

"যাকে হিকমত ও প্রজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকে অধিক কল্যাণদান করা হয়েছে"। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৯)

রাসূল সা. বলেন ঃ

" لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا، وَيُعَلِّمُهَا "

দুইটি জিনিস ছাড়া বিদ্বেষ করা যায়না। আল্লাহ কাকেও সম্পদ দান করলে সে তা সত্য পথে খরচ করে, আর কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ হিকমত বা জ্ঞান দান করলে সে উহার সাহায্যে ন্যায় বিচার করে এবং মানুষকে শিক্ষা বা জ্ঞান দেয়। (বুখারী কেতাবুল ইলম)

৫। হিকমত অর্থ ন্যায় বিচার।

যুদ্ধ ক্ষেত্রে একজন সৈনিক শত্রু সৈন্যকে নির্দিষ্টস্থানে নির্ধারিত অস্ত্রের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করে। কিন্তু একজন দাঈ দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের বিরোধিতা বহু প্রকারের সৈন্য, বহু রকমের অস্ত্রের ও বহু পদ্ধতির মুকাবিলা করে। যেভাবে একজন রোগী একইসাথে বহু প্রকারের রোগের ও সমস্যার মুকাবিলা করে। এখানে কারও অন্তর অসুস্থ আবার কেহ আবেগ দিয়ে ধর্ম পালন করছে। আবার কেউ পুর্বপুরুষদের অনুকরণ করছে, আবার কেউ দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন। আবার কেউ নির্দিষ্ট কয়েকটি নিয়ম পালনে ব্যস্ত। কেউ কোন পীরের হাতে বন্দী হয়েছে আছে। আবার কেউ বিদয়াত ও শিরকের মধ্যে লিপ্ত। আবার কেউ নতুন নতুন নিয়ম কানুন বানিয়ে নিচ্ছে, কেউ নফলকে ফরয মনে করে আদায় করছে, আর ফরয ত্যাগ করে বসে আছে, কেউ কুরআনের চেয়ে ব্যক্তির বাণীকে অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। কেউ কুরআনের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষকে ইসলাম থেকে দুরে সরিয়ে দিচ্ছে। কেউ যেয়ারতের নামে কবরপুজা করছে। উল্লিখিত বিষয়ে সঠিক পথ দেখাবার ও চিকিৎসার জন্য দাঈ নিজকে মনে করবে সে বড় একটি হাসপাতাল এখানে সকল রোগের নিরাময়ের ঔষধ পাওয়া যাবে। এসবের চিকিৎসার জন্য তাকে দায়িত্ব নিতে হবে, এবং সে মোতাবেক যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যাতে করে লোকে মনে করে তার কাছে সকল রোগের চিকিৎসা ও ঔষধ রয়েছে। তার উপর রোগীদের আস্থা ও নির্ভরশীলতা রয়েছে। যেমনিভাবে কঠিন রোগের সময় মানুষ বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়, তেমনি দাঈকে দাওয়াতের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ হতে হবে। একজন হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসা দ্বারা যেমনি রোগ নিরাময় হয়না, তেমনি অনভিজ্ঞ একজন দাঈ দ্বারা আল্লাহর পথে মানুষদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিবর্তন করার কাজও হয়না। এ ধরনের হাতুড়ে ডাক্তারের চিকিৎসায় যেমন অকালে রোগীকে মৃত্যুবরণ করতে হয় এবং ডাক্তারকে পালিয়ে যেতে হয়, তেমনি মূর্খ ও অনভিজ্ঞ দাঈ দ্বারা মানুষকে জাহিলিয়াতের পথ থেকে আলোর পথে আনা যায় না। এতে দাঈ নিজেও ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং লোকেরা আরো বেশী অন্ধকারের নিমজ্জিত হয়।

হিকমতের ব্যবহার ঃ

১। প্রাথমিক জিনিসগুলো প্রথমে উপস্থাপন করা ঃ

দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রথমে ইবাদত ও উত্তম চরিত্র গঠনের দিকে আহ্বান না করে ইসলামের মূল আকীদার দিকে আহ্বান করা, নফল ও মোস্তাহাবের প্রতি প্রথমে গুরুত্ব না দিয়ে ফরয ও ওয়াজেবের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া। মাকরুহ এর চেয়ে হারাম জিনিস এবং ব্যক্তির সমস্যার চেয়ে সাধারণ সমস্যার প্রতি গুরুত্ব দেয়া।

রাসূল সা. দীর্ঘ ১৩ বৎসর মক্কাতে ইবাদত ও আখলাকে গুরুত্ব না দিয়ে আকীদা ও বিশ্বাসের গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং শিরকমুক্ত স্বচ্ছ আকীদার প্রতি মানুষকে আহ্বান করেছেন। তারপর তিনি শরীয়ত ও ইসলামের আহকামসমূহ পালনের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। যার উদাহরণ আমরা মুয়ায ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে দেখতে পাই।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: «إِنَّكَ تَأْتِي قوما من أهل الْكتاب. فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَإِنْ هُمْ أطاعوا لذَلِك. فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ. فَإِنْ هم أطاعوا لذَلِك فأعلمهم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد فِي فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَين الله حجاب»

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত নবী করিম সা. মুয়াযকে ইয়ামনের শাসনকর্তারূপে প্রেরণ করার সময় এ মর্মে উপদেশ দেন যে হে মুয়ায! তুমি এমন স্থানে যাচ্ছ যেখানকার অধিবাসীরা হল আহলে কিতাব (য়াহুদী ও খ্রীষ্টান) সুতরাং তুমি তাদেরকে সর্ব প্রথম (আল্লাহর দ্বীনের দিকে) এ মর্মে দাওয়াত দিবে যে, তারা সাক্ষ্য দিবে। আল্লাহ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই এবং মুহাম্মদ সা. অবশ্যই তার রসূল। যদি তারা এ কথা মেনে নেয়, তাহলে তাদেরকে বলবে যে, আল্লাহ তাদে উপর দিন-রাত মোট পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয করেছেন। যদি তারা এটা মেনে নেয় তা হলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন, যা ধনীদের কাছে থেকে আদায় করে দরিদ্রের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে সাবধান তাদের সর্বোত্তম মাল (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করবেনা। আর মযলুম লোকদের বদদোয়াকে অবশ্যই ভয় করবে। কেননা নিপীড়িত লোকের ফরিয়াদ ও আল্লাহর মাঝখানে কোন পর্দা থাকে না। (বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত হাদীসে দাওয়াতের বিষয়গুলোকে পর্যায়ক্রমিক উপস্থাপন করা হয়েছে, (১) তাওহীদ ও আকীদাহ (২) ইবাদত (৩) অন্যের হক ও (৪) মুয়ামেলাত।

২। অবস্থা ও সামর্থ অনুযায়ী দাওয়াত দেয়া

যেমনিভাবে কুরআন একসাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল না করে পর্যায়ক্রমে নাযিল করা হয়েছে, আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾

"কাফেরগণ বলে তার প্রতি সমস্ত কুরআন একদফায় অবতীর্ণ হলনা কেন? আমি এভাবে কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃতি করেছি আপনার অন্তকরণকে মজবুত করার জন্য"। (সূরা ফুরকান ঃ ৩২)

প্রথমে কুরআনের জান্নাত ও জাহান্নামের কথাগুলো উল্লোখ করে ছোট ছোট সুরাহ নাযিল করা হয়েছে। যাতে করে মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তারপর হালাল ও হারামের আয়াতসমূহ নাযিল করা হয়। যদি প্রথমেই বলা হতো। لا تشربوا الخمر তোমরা মদ পান কর না। তাহলে মানুষ বলত ابدا لا ندع الخمر আমরা কখনও মদ পান পরিত্যাগ করবোনা এবং যদি নাযিল করা হতো জিনা করোনা তাহলে তারা বলতো আমরা কখনও জিনা ত্যাগ করবোনা। (ফতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃ ঃ ৩৯) কুরআন প্রথমে দাওয়াতের ক্ষেত্রে আকীদার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু করেছে, যাতে করে মানুষের অন্তরে তাওহীদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত

হয়। তারপর বিস্তারিত ও পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহ ঘোষণা করেন।

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম"। (সূরা মায়েদা ঃ ৩)

উমর ইবনে আবদুল আজিজের ছেলে আবদুল মালিক একদিন তার পিতাকে বলল আপনি কেন আল্লাহর আদেশ তাড়াতাড়ি বাস্তবায়িত করছেন না? উমর বললেন ঃ হে বৎস তাড়াহুড়া করোনা, আল্লাহ তায়ালা কুরআনে দুইবার মদের আপকারিতার কথা বলেছেন এবং তৃতীয়বারে উহা হারাম হওয়ার ঘোষণা করেন। আমার ভয় হচ্ছে আমি কোন সত্যকে একবারেই মানুষের উপর জারি করে দেই, আর তারা প্রথমবারেই উহাকে প্রত্যাখ্যান করে, তাতে সমাজে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। (সাতেবী ঃ মুয়াফেকাত, ২য় খণ্ড, পৃ ঃ ৯৩)

৩। ব্যক্তির অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখা

এক যুবকের রাসূল সা. এর নিকট জ্বিনার অনুমতি চাওয়া

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: إِنَّ فَتًى شَابًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا، فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ وَقَالُوا: مَهْ مَهْ. فَقَالَ: « ادْنُهْ، فَدَنَا مِنْهُ قَرِيبًا ». قَالَ: فَجَلَسَ قَالَ: « أَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ؟ » قَالَ: لَا. وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: « وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ ». قَالَ: « أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ؟ » قَالَ: لَا. وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ قَالَ: « وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ ». قَالَ: « أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ؟ » قَالَ: لَا. وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: « وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ ». قَالَ: « أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ؟ » قَالَ: لَا. وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: « وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ ». قَالَ: « أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ؟ » قَالَ: لَا. وَاللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: « وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ ». قَالَ: فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: « اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ »

আবি উমামা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ একজন যুবক রাসূল সা. এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল সা. আমাকে জ্বিনার অনুমতি দিন। তার একথা শুনে উপস্থিত লোকেরা তারদিকে এগিয়ে আসলো, এবং তাকে ধমক দিয়ে বললো, চুপ থাক। অতঃপর রাসূল সা. বললেন, কাছে আস, তখন সে যুবক রাসূল সা. এর কাছে এসে বসলো। রাসূল সা. বললেন তুমি কি তোমার মায়ের সাথে একাজ করতে পছন্দ কর? সে বললো না, আল্লাহ তোমার জন্য আমাকে কুরবান কুরুক। মানুষ তাদের মায়ের সাথে একাজ করাকে কখনও পছন্দ করেনা। রাসূল সা. বললেন তুমি কি তোমার মেয়ের সাথে একাজ করা পছন্দ কর। সে বললো না, তুমি কি তোমার বোনের সাথে একাজ করতে পছন্দ কর? সে বললো না। আবার রাসূল সা. বললেন, তুমি কি তোমার ফুফুর সাথে, তোমার খালার সাথে একাজ পছন্দ কর। সে বললো না, মানুষ কখনও একাজ পছন্দ করেনা। তখন রাসূল সা. তার বুকে হাত রেখে বললেন ঃ

اللهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ

হে আল্লাহ তার গুনাহ ক্ষমা কর। তার অন্তর পবিত্র কর, তার লজ্জাস্থানকে হেফাজত কর। (মুসনাদ আহমদ, ৫ম খণ্ড, পৃ ঃ ২৫৬)

উক্ত হাদীসে প্রশ্নকারী যুবক যে অবস্থায় রাসূল সা. এর নিকট জ্বিনার অনুমতি প্রার্থনা করে সে অবস্থায় রাসূল সা. তাকে হিকমত ও প্রজ্ঞার সাথে এ কাজ থেকে বিরত করার চেষ্টা করে সফল হন।

৪। মন্দের জবাব উত্তম কথা দিয়ে দেয়াঃ

যায়েদ ইবনে সায়ানা নামক এক ইয়াহুদী রাসূল সা. এর দাওয়াতের সত্যতা পরীক্ষা করার জন্য তার নিকট আসে ইতিপূর্বে সে রাসূল সা. এর নিকট নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করার শর্তে কিছু খেজুর বিক্রি করে। কিন্তু ঐ সময় শেষ হওয়ার পূর্বেই সে জনসম্মুখে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় তা দাবী করে তার কথাটি ছিল বনু আব্দিল মোত্তালিবের বংশধর তালবাহানারকারী তার একতা শুনে উমর রা. আক্রমণাত্বক ভূমিকায় এগিয়ে আসলেন, রাসূল সা. উমর রা. কে বারণ করলেন এবং বললেন হে উমর! আমার এবং তার প্রয়োজনটা সবার চেয়ে বেশী। সে আমাকে ভালভাবে পরিশোধ করার আদেশ দিবে। য়াহুদী রাসূল সা. এ ব্যবহার দেখে তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করে। (তাবরানী) ইমাম হাসানুল বান্নার উক্তি তোমরা গাছের মত হও, মানুষ গাছে পাথর নিক্ষেপ করবে আর সে তাদেরকে ফল নিক্ষেপ করবে।

৫। সকল জিনিস সহজ ভাবে উপস্থাপন করা

দাওয়াতের ক্ষেত্রে প্রতিটি জিনিস সহজভাবে পেশ করা কোন প্রকারেই কঠিনভাবে প্রকাশ না করা। আজকের বড় সমস্যা হলো যারা দাওয়াতের কাজ করেন, তারা সকল বিষয়কে কঠিনভাবে উপস্থাপন করে যাতে মানুষ মনে করে ইসলামে সহজের কোন স্থান নেই। তারা নামায, অযু, পোশাক, খাওয়া-দাওয়া, অন্যের সাথে উঠাবসা, ক্রয়-বিক্রয় এমহনকি ফরয, সুন্নত, মুস্তাহাব ও নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে কঠিনতা প্রকাশ করে। এবং তারা এটাকে সঠিক পদ্ধতি মনে করে, অথচ তারা রাসূল সা. এর সঠিক পদ্ধতির পরিপন্থী কাজ করে। অনেক সময় দেখা যায় তারা ইসলামের মূল জিনিসগুলোর প্রতিও লক্ষ্য রাখে না। এমন কি তারা ফরয, ওয়াজেব সুন্নত, হারাম ও মকরুহের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তারাই একদলকে কাফের আর একদলকে ফাসেক বলছে। মনে হয় আল্লাহ তাদেরকে মুসলমানদেরকে কাফের ঘোষণার জন্য মনোনীত করেছেন। এ সমস্ত লোকেরাই ইসলামের সামনে বড় প্রতিবন্ধক। এদের কারণেই মানুষ দ্বীন থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, আবার সহজ করার অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কোন অলসতা প্রদর্শন করা। সহজ পন্থা অবলম্বন করার জন্য রাসূল সা. বলেন ঃ

«يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا، وَسَكِّنُوا وَلَا تُنَفِّرُوا»

তোমরা সহজ কর কঠিন করো না, এবং সুসংবাদ দাও, দুরে নিক্ষেপ করোনা। (বুখারী)

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত রাসূল সা. এর নিয়ম ছিল তিনি দুটি কাজের মধ্যে যেটি সহজ, তিনি সর্বদা সেটি গ্রহণ করতেন, যদি

সেটি গুনাহের কাজ না হতো, যদি গুনাহের কাজ হতো তিনি সকলের পূর্বে তা ত্যাগ করতেন। (এবনে মাযা)

৬। সহজভাবে উপদেশ দেওয়া

আল্লাহ বলেন ঃ

﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى﴾

তোমরা উভয়েই ফেরাউনের কাছে যাও, কারণ সে নাফরমানী করেছে। তাকে নরমভাবে কথা বল, সম্ভবতঃ সে স্মরণ করবে এবং ভয় করবে। (সূরা তাহা ঃ ৪৩-৪৪)

ইমাম গাজ্জালী রা. তার আমরু বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার বইতে লিখেছেন যে ব্যক্তি ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং খারাপ কাজে নিষেধ করে তার ধৈর্য সহানুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা থাকতে হবে। তিনি একটি ঘটনা উল্লেখ করেন, একবার এক ব্যক্তি খলিফা আল-মামুনের দরবারে এসে কর্কশ ভাষায় পাপ ও পূর্ণ বিষয়ক পরামর্শ দান শুরু করল। ফিকাহ সম্পর্কে আল-মামুনের ভাল জ্ঞান ছিল। তিনি লোকটিকে বললেন ভদ্রভাবে কথা বল, আল্লাহ তোমার চেয়েও ভাল লোককে আমার চেয়েও একজন খারাপ শাসকের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন এবং তাকে নম্রভাবে কথা বলার আদেশ দিয়েছেন। তিনি মুসা ও হারুনকে-যারা তোমার চেয়েও ভাল, ফিরাউনের যে আমার চেয়ে খারাপ ছিল তার কাছে পাঠিয়ে দেন এবং তাদেরকে আদেশ দিলেন, তোমরা তার সাথে নম্রভাবে কথা বলবে। রাসূল সা. সর্বদা সাহাবাদেরকে এর প্রশিক্ষণ দিতেন।

عن ابى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ،

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন একজন মরুবাসী মসজিদে পেসাব করে দিলে লোকেরা তার উপর আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে। তখন রাসূল সা. বললেন, তাকে ছেড়ে দাও, এবং পেসাবের স্থানে এক বালতি পানি ঢেলে দাও। নিশ্চয়ই তোমাদেরকে সহজ করার জন্য পাঠানো হয়েছে কঠিন করার জন্য নয়। (বুখার)

দয়া ও সহজ ব্যবহার দাঈকে মানুষের নিকটতম করে দেন, এবং তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ও ভালবাসা সৃষ্টি করে।

৭। সম্মান দিয়ে কথা বলা

হোসাইন নামে এক ব্যক্তিকে মক্কার কুরাইশগণ খুবই সম্মান ও শ্রদ্ধা করতো, তারা সকলে মিলে তাকে রাসূল সা. এর নিকট তার দাওয়াত বন্ধ করার ব্যাপারে কথা বলার জন্য পাঠালো। তিনি যখন রাসূল সা. এর নিকট গেলেন তখর রাসূল সা. তাকে সম্মানের সাথে বললেন আসুন, হোসাইন বললো আমি শুনতে পেলাম তুমি নাকি আমাদের উপাস্যগুলোকে গালি দিচ্ছ। রাসূল সা. বললেন হোসাইন তোমরা কতজন প্রভুর উপাসনা কর? উত্তরে হোসাইন বলল জমিনে সাতজন ও আকাশে একজনের উপাসনা করি। তোমরা যখন বিপদে পড় তখন কাকে ডাক? সে বলল যিনি আকাশে আছে তাকে ডাকি। তোমাদের ধন-সম্পদ যখন নষ্ট হয় তখন কাকে ডাক? সে বলল, যে আকাশে আছেন তাকে ডাকি। রাসূল সা. বললেন, তোমরা একজনের কাছে প্রার্থনা কর অথচ তার সাথে শরিক কর। তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তি পাবে। রাসূল সা. এর আহ্বানে সে ইসলাম গ্রহণ করে। তখন রাসূল সা. সাহাবীদের বললেন, তাকে সম্বর্ধনা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাও। (সিরাতে হালাবীয়া, ১ম খণ্ড, পৃ ঃ ৩১৮)

দাওয়াতের ক্ষেত্রে সর্বদা শ্রোতাদের অবস্থান এবং তাদের যোগ্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য মানুষিকভাবে প্রস্তুত না করে তার উপর এমন বোঝা চাপিয়ে দেওয়া যাবে না, যা সে বহন করতে অক্ষম।

الموعظة الحسنة **(উত্তম নসিহত)**

الموعظة আভিধানিক অর্থে وعظه يعظه وعظا শব্দযোগে গঠিত অর্থ তাকে ওয়াজ করেছি, নসিহত করেছি, ও পরিনাম সম্পর্কে স্বরণ করিয়ে দিয়েছি। তাকে আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছি ও অসিয়ত করেছি।

الحسنة এর বিপরীত শব্দ السئية ওয়াজ কখনও حسنة কখনও سئية হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আল্লাহ বলেন, ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ

'আপনি আপনার পালনকর্তার প্রতি আহবান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উপদেশ শুনিয়ে উত্তম রুপে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দযুক্ত পন্থায়। (সূরা নাহল: ১২৫)

পারিভাষিক অর্থে সমর্থক শব্দ নসিহত الموعظة الحسنة বা উপদেশ। এ শব্দটি বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার হয়। পারিভাষিক অর্থে সত্য কথা এমনভাবে বলা যার মধ্যে মানুষের অন্তরকে নরম ও প্রভাবিত করে। দ্বিধাদ্বন্দ্ব হতে অন্তর খোলে যায় এবং অন্তরকে ঈমান ও হেদায়েতের জন্য তৈরী করে।

ওয়াজ দুই প্রকার, দ্বীনি ঈলম তার মূল হলো তাওহীদ কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে উহা পেশ করতে হয়ে। ২য় হলো আধুনিক জ্ঞান।

উহাবিভিন্ন রকম ব্যবহার হয়

১. কোমল বক্তব্য

২. এমন ইশারা যা শ্রোতা বুঝতে সহজ হয়।

৩. কিচ্চা, আকর্ষণীয় খুতবা যা অন্তরকে নাড়াদেয়।

৪. আল্লাহর নেয়ামতের স্বরণ করে দেয়া যাতে সে শুকর করতে বাধ্য হয়।

৫. প্রসংশা ও নিন্দা

৬. উৎসাহিত করা ও ভীতিপ্রদর্শন

৭. বিজয়ের আশা ও প্রতিষ্ঠা লাভ

৮. কষ্ট সহ্য করা ও সবর করা।

ওয়াজের বৈশিষ্ট্য:

১. ভাষা সহজ করে বলা: সঠিক স্থানে সঠিক কথা বলা যাতে শ্রোতাগণ সহজে বুঝতে পারে।

২. শ্রোতাদের অন্তরকে প্রভাবিত করে এমনভাবে কথা বলা যে,

(ক) দ্রুত গ্রহণ করতে পারে এমনভাবে কথা বলা (খ) শ্রোতাদের অন্তরে ভালবাসা ও মহব্বত সৃষ্টি হয় এমন ভাবে কথা বলা।

যেমন: ১. একজন মরুবাসী মসজিদে প্রস্রাব করলে লোকেরা তাকে প্রহার করার জন্য এগিয়ে আসে তখন রাসূল সা. বললেন, তোমরা এক বালতি পানি নিয়ে আস এবং প্রস্রাবের স্থানে ঢেলে দাও। লোকটি এ আচারণে মুগ্ধ হয়। (রিয়াযুস সালেহিন, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৪)

দাওয়াত পৌঁছাবার এটা অন্যতম পদ্ধতি ঃ

রাসূল সা. উত্তম ওয়াজ ও নসিহতের সাহায্যে মানুষের নিকট দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেন। দাঈদের অবশ্যই একজন সফল ডাক্তার হতে হবে। সে প্রথমে চিন্তা করবে, কোথা থেকে শুরু করবে। ঔষধ নির্ধারণ করার পূর্বে তাকে প্রথমে রোগ নির্ণয় করতে হবে। রোগ নির্ণয় না করে ঔষধ দিলে রোগ কখনও ভাল হবে না। কারণ আমাদের সমাজের মানুষ বিভিন্ন চিন্তাধারায় আকৃষ্ট ও প্রভাবিত। এসব বিভিন্ন চিন্তাধারার লোকদের জন্য বিভিন্ন ঔষধের প্রয়োজন। সকলকে এক ঔষধ দিলে কোন ফল হবে না। প্রথমতঃ তাকে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে হবে। তারপর তা দূর করার চেষ্টা করতে হবে। বিভিন্ন চিন্তার মানুষদেরকে একত্রিত করে সত্য ও হকের পথে আনা সহজ কাজ নয়। যে কারণে আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে তার সমাজের গোমরাহী দূর করে সত্য পথের সন্ধান দেয়ার জন্য তাকে তৎকালীন সমাজের একজন উত্তম চিকিৎসক হিসাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে দ্বীনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। দুনিয়া পুজারী লোকদেরকে কবরবাসীদের ভাষায় দাওয়াত দিলে কোন ফল হবে না। তেমনি বস্তুবাদী ও নাস্তিকদেরকে নরম কথায় দাওয়াত দিলে কোন কাজ হবেনা।

দাওয়াতদানকারী অবশ্যই সময় স্থান ও শ্রোতাদের অবস্থানকে লক্ষ্য রেখে ওয়াজ করতে হবে। রাসূল সা. বলেন, আমাকে মানুষের বৃদ্ধি ও বিবেকের দিকে লক্ষ্য রেখে কথা বলার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (তাবরানী, পৃ ঃ ১২৫)

দাওয়াতের ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি ঃ

পবিত্র কুরআন আমাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে যাবতীয় আহকাম পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা করেছে। সে সব আহকামের মধ্যে ইসলামী দাওয়াতের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছে। সেখানে দাঈকে অত্যন্ত সহজ ও নরম ভাষায় দাওয়াত প্রদান এবং উত্তম পদ্ধতি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। কুরআনের সকল কেচ্ছাগুলো আচেনা করলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

যেমন মুসা আ. ও ফেরাউনের ঘটনা ঃ কিভাবে মুসা আ. ফেরাউনের নিকট দাওয়াত প্রদান করেন? তিনি অত্যন্ত ভদ্রোচিত, নরম ও উত্তম ভাষণের মাধ্যমে ফেরাউনকে দাওয়াত দেন।

﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى - فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى - قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى - قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى - فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى﴾

"তোমরা উভয়েই ফেরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। তোমরা তাকে নরম কথা বল, হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভয় করবে। তারা বলল, হে আমাদের রব আমরা আশঙ্কা করছি সে আমাদের প্রতি জুলুম করবে, কিংবা বাড়াবাড়ী করবে। আল্লাহ বলেনঃ তোমরা ভয় করোনা, আমি তোমাদের সাথে আছি, শুনি ও দেখি। অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বলঃ আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রাসূল সা. আমাদের সাথে বণি ঈসরাঈলদের যেতে দাও, এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার রবের কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে এসেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে তার প্রতি শান্তি"। (সূরাহ তোয়া-হা ঃ ৪৩-৪৭)

বিদ্রোহী ফেরাউন খোদায়ী দাবী করে বলল ঃ

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾

"ফেরাউন বলল হে পরিষদবর্গ আমি জানিনা যে, আমি ব্যতিত তোমাদের কোন উপাস্য আছে"। (সূরা ক্বাসাস ঃ ৩৮)

এমতাবস্থায় আল্লাহ মুসা ও তার ভাই হারুনকে বললেন ঃ তোমরা তার সাথে নরম কথা বল, সম্ভবতঃ সে আল্লাহকে, স্বরণ করবে এবং ভয় করবে। নরম ও সহজ কথা অনেক সময় শ্রোতাদেরকে প্রভাবিত করে, তাদের অন্তর নরম হয় এবং আল্লাহকে ভয় করে সত্যের পথে এগিয়ে আসে। তারপর বলা হলো তোমরা উভয়েই তাকে দাওয়াত দাও এবং সালাম দিয়ে বিদায় গ্রহণ কর।

উক্ত আয়াতে ফেরাউনের নিকট ইসলামী দাওয়াত পেশ করার উত্তম পদ্ধতি আল্লাহ শিক্ষাদান করেন।

তেমনিভাবে ইব্রাহীম আ. ও তার পিতার ঘটনা ঃ এখানে বিরুধীদের পক্ষ থেকে কঠিন বিরুধিতা ও শক্তি প্রয়োগ সত্তেও তাদের নিকট উত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াত প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا - إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا﴾

"আপনি এই কিতাবে ইব্রাহীমের কথা বর্ণনা করুন, নিশ্চয় তিনি ছিলেন সত্যবাদী নবী। যখন তিনি তার পিতাকে বললেন ঃ হে আমার পিতা! যে শুনেনা দেখেনা এবং তোমার কোন উপকারে আসেনা কেন তার ইবাদত কর"। (সূরা মারইয়াম ঃ ৪১-৪২)

আমরা দেখি এখানে ইব্রাহীম (আ) তার পিতাকে সুন্দর ও মিষ্টি ভাষায় আহ্বান করেনঃ اي تبا হে পিতা বলে তিনি একথা চারবার সম্বোধন করেন। যাতে করে পিতার অন্তরে সন্তানের যে স্নেহ ও ভালবাসা এবং পিতার প্রতি যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি তা যেন কোন ভাবে নষ্ট না হয়, বরং তিনি পিতা ও পুত্রের যে সম্পর্ক তার প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

তারপর তিনি বৃদ্ধিবৃত্তিক উত্তম বক্তব্য পেশ করেন, এবং সে বিষয়ে পিতাকে চিন্তা ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করার আহ্বান করেন। তিনি বলেনঃ

لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا

তোমরা কেন এমন বস্তুর ইবাদত কর যে শুনেনা, দেখেনা এবং যে তোমার কোন উপকার আসেনা।

তেমনিভাবে আল্লাহ তার কেতাবে মুহাম্মদ সা. কে তার জাতির

নিকট কিভাবে দাওয়াত পেশ করবে তার শিক্ষা দিলেনঃ

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ - قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾

"বল, আকাশ ও পৃথিবী থেকে কে তোমাদেরকে রিযিক দেয়। বলুন আল্লাহ। আমরা অথবা তোমরা সৎপথে অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছি ও আছ বলুন আমাদের অপরাধের জন্যে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবেনা। এবং তোমরা যা কিছু কর সে সম্পর্কে আমরা জিজ্ঞাসিত হবনা"। (সূরা সাবা, ২৪-২৫)

উক্ত আয়াতে আল্লাহ প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের নিকট থেকে আল্লাহকে স্বীকার করার স্বীকৃতি নিয়েছেন। তারপর আল্লাহ রাসূল সা. কে লক্ষ্য করে বলছেন, তুমি তাদেরকে বল, আমরা এবং তোমরা দুইটি জিনিসের যে কোন একটির মধ্যে অবস্থান করছি, হয়ত আমরা হেদায়েতের পথে অথবা প্রকাশ্য গোমরাহীর মধ্যে রয়েছি। তিনি অবস্থার বর্ণনা করেছেন কিন্তু কারা হেদায়েত ও গোমরাহীর মধ্যে রয়েছে সে কথা বর্ণনা করেনি। রাসূল সা. সর্বদা নরম ও মিষ্টি ভাষায় দাওয়াত দিতেন।

মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম রাসূল সা. এর সম্পর্কে বলেনঃ মুয়াবীয়া যখন নামাযের মধ্যে অন্য ব্যক্তির হাচির জবাব দিলেন, সাহাবাগণ তখন তাকে ভৎসনা করলেন। এমতাবস্থায় মুয়াবীয়া বলেন, রাসূল সা. আমাকে এমন উত্তম শিক্ষা দিলেন যা কখনও আমি পাইনি। আল্লাহর শপথ তিনি আমাকে তিরস্কার করলেন না, আমাকে মারলেন না। এবং কোন প্রকার মন্দও বললেন না। তিনি বললেনঃ

«إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ»

নামাযে কোন কথা বলা উচিৎ নয় নামাযে শুধু তাসবীহ, তাকবীর ও কুরআন পড়তে হয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৭)

হাদীসের একটি ঘটনাঃ মসজিদের একজন ইমাম সর্বদা নামাযে দীর্ঘ কেরাত পড়তেন যে কারণে লোকেরা দেরী করে ফযরের জামাতে অংশ গ্রহণ করত। রাসূল সা. যখন ঘটনা জানতে পরলেন তখন ইমামের একাজে রাগান্বিত হলেন। (ড. মোহাম্মদ তশী সাবাহ, খাওয়াতের ফি আদ-দাওয়াহ ইলাল্লাহে বৈরুত ঃমকতব ইসলামী) পৃ ঃ ১১২।

উকবা ইবনে উমর থেকে বর্ণিত এক ব্যক্তি রাসূল সা. এর নিকট এসে বলল, আমি ইমামের লম্বা কেরাতের কারণে ফযরের নামাযে দেরীতে অংশ গ্রহণ করি, রাসূল সা. তার কথা শুনে সেদিনের ওয়াজে এমন কঠিন ভাবে রাগ করলেন যা পূর্বে কোন দিন করেননি। তারপর বললেন হে মানুষ তোমাদের মধ্যে দুরে নিক্ষেপকারী ব্যক্তি আছে। যে ব্যক্তি মানুষের ইমামতী করে সে যেন নামায সংক্ষেপ করে, কারণ তার পিছনে বৃদ্ধ, বালক ও বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি থাকতে পারে। (বুখারী, ৯ম খণ্ড, পৃ ঃ ৫৪, রিয়াদুস সালেহীন, হাদীস নং-৩৮৮)

রাসূল সা. এর ওয়াজের পদ্ধতি

(১) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওয়াজ ঃ

রাসূল সা.সাহাবাদরে সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ওয়াজ করতেন। এ ধরনের ওয়াজ ও নসিহতে শ্রোতাদের মধ্যে উপস্থাপিত কথাগুলো অধিক গুরুত্ব লাভ করে এবং তারা অতি সহজে তা গ্রহণ করে। যেমন ঃ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟» قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ: «إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ، وَصِيَامٍ، وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ»

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান কোন ব্যক্তি গরীব? সাহাবগণ বললেন, আমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি গরীব যার কোন অর্থ সম্পদ নেই। তিনি বললেনঃ আমার উম্মতের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে গরীব হবে, যে কিয়ামতের দিন নামায-রোযা, যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদতকারীরূপে আবির্ভূত হবে, কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাৎ করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে, এবং কাউকে মেরেছে, সে এসব গুনাহ সাথে করে নিয়ে আসবে। এদেরকে তার নেক আমলসমূহ দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবী পূরণ করার পূর্বে যদি তার নেক আমল ও শেষ হয়ে যায়। তবে দাবীদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে অতঃপর তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (ইমাম মুসলিম, রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬)

(২) শপথের মাধ্যমে ওয়াজ করা ঃ

শপথের মাধ্যমে শ্রোতাদেরকে কাজটি পরিত্যাগ করার গুরুত্ব অনুধাবন করানো।

قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لاَ يُؤْمِنُ» قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ»

রাসূল সা. বলেন, আল্লাহর শপথ তুমি মুমেন হতে পারবে না, মুমেন হতে পারবেনা, মুমেন হতে পারবে না। তাকে প্রশ্ন করা হলো, সেই ব্যক্তি কে? রাসূল সা. বললেন যার অত্যাচার ও জুলুম থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। (বুখারী)

(৩) উদাহরণ দিয়ে ওয়াজ পেশ করাঃ

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: « إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ، وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً »

আবু মুসা আশয়ারী (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ রাসূল সা. বলেন ঃ সৎ সহকর্মী ও পাপী সহযোগীর দৃষ্টান্ত হলঃ একজন কস্তুরীর

ব্যবসায়ী, অপরজন কামার। কস্তুরীর ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তুরী দেবে, অথবা তুমি তার কাছ থেকে কিনে নিবে। যদি এর দুটোর একটিও না হয়, তবে অন্ততঃ তুমি তার কাছে এর সুঘ্রাণ পাবে। (অর্থাৎ দোকান থেকে বের হয়ে আসলেও তোমার শরীর থেকে কস্তুরীর সুগন্ধি ছড়াবে।) আর কামারের দোকানে বসলে হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথ বা তুমি তার কাছ থেকে দূর্গন্ধ পাবে। (বুখারী, কিতাবুশ-শারিকাহ, হাদীস নং ২৩১৩)

عَنِ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ المَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا، وَنَجَوْا جَمِيعًا »

নোমান ইবনে বশীর থেকে বর্ণিতঃ রাসূল সা. বলেন ঃ আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমা অতিক্রমকারীর দৃষ্টান্ত হল। একদল লোক লটারী করে একটি জাহাজে উঠলো, তাদের কতক নীচের তলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান পেল। নীচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে পানি আনতে যায়। তখন নীচের তলার লোকেরা পরস্পর বললঃ আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটি ফুটো করে নেই তবে।

উপর তলার লোকদের কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা যেত। যদি তারা (উপর তলার লোকেরা) তাদেরকে এ কাজ করতে দেয় তবে সবাই ধ্বংস হবে, আর যদি তারা তাদেরকে বাঁধা দেয় তবে নিজেরাও বাঁচতে পারবে এবং সবাইকে বাঁচাতে পারবে। (রিয়াদুস সালেহীন, ১ম খণ্ড, পৃ ঃ ১১২)

(৪) বাস্তব ঘটনাকে সামনে রেখে নসিহত করা ঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوقِ، دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ، وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ، فَمَرَّ بِجَدْيٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ؟» فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ؟» قَالُوا: وَاللهِ لَوْ كَانَ حَيًّا، كَانَ عَيْبًا فِيهِ، لِأَنَّهُ أَسَكُّ، فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ؟ فَقَالَ: «فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ، مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ»،

জাবের রা. থেকে বর্ণিত। একদা রাসূল সা. কোন একটি বাজারের উপর দিয়ে যাচ্ছিলেন, আর তার দুপাশে ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম। তিনি যখন একটি কান কাটা মরা ছাগল ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ছাগলের এক কান ধরে তাদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের বিনিময়ে এটা কিনে নিতে রাযী আছ? তারা বললেন, আমরা কোন কিছুর বিনিময়ে এটা নিতে রাযী নই, আর আমরা এটা দিয়ে করবোই বা কি? তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা বিনামূল্যে এটা নিতে রাযি আছ? তারা বললেন, আল্লাহর শপথ এটা যদি জীবিতও থাকতো তবুও ত্রুটিপূর্ণঃ কেননা এটার কান কাটা তবে মৃতটাকে দিয়ে কি হবে? অতঃপর তিনি বললেন আল্লাহর কসম করে বলছি তোমাদের কাছে এ ছাগল ছানাটা যেরূপ নিকৃষ্ট দুনিয়াটা আল্লাহর কাছে এর চাইতেও বেশী নিকৃষ্ট। (রিয়াদুস সালেহীন, ২য় খণ্ড, পৃ ঃ ৪৭)

(৫) চিত্র ও রেখার মাধ্যমে নসিহত করা ঃ

عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُنْذِرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطًّا مُرَبَّعًا، وَخَطَّ خَطًّا فِي الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ، وَخَطَّ خُطَطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الوَسَطِ، وَقَالَ: « هَذَا الإِنْسَانُ، وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ - أَوْ: قَدْ أَحَاطَ بِهِ - وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجٌ أَمَلُهُ، وَهَذِهِ الخُطَطُ الصِّغَارُ الأَعْرَاضُ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَشَهُ هَذَا »

“ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সা. একটি চতুষ্কোণ রেখা টানলেন। তার মধ্যখানে আরেকটি রেখা টানলেন যা তার বাইরে পর্যন্ত চলে গিয়েছে। মধ্যবর্তী এ রেখাটির সাথে আরো কতগুলো ছোট ছোট রেখা (আড়াআড়ি) টানলেন। তারপর বললেন এটা হল মানুষ। আর এটা তার মৃত্যু-যা কিনা তাকে বেষ্টন করে আছে। বা যাকে সে বেষ্টন করে আছে। বাইরে বেরিয়ে যাওয়া রেখাটুকুন তার আশা আকাংখা। ছোট ছোট রেখাগুলো হল তার জীবনের ঘটনাবলী। কোন একটি ঘটনা দুর্ঘটনা তার জীবন থেকে ফসকে গেলে অপরটি তাকে আচড় দেয়। তার থেকে যদি সে রেহাই পায় তাহলে তৃতীয়টি তাকে নিস্পেষিত করে দেয়। (বুখারী)

(৬) ওয়াজ নসিহতে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাঃ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا»

“যাবের ইবনে সামরা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসূল সা. এর সাথে নামায পড়ছিলাম তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে নামায আদায় করতেন”। (মুসলিম)

عن ابي الْيَقْظَانِ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ، مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا»

“আবুল ইয়াকযান আম্মার ইবনে ইয়াসির রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূল সা. কে বলতে শুনেছি, দীর্ঘ নামায ও সংক্ষিপ্ত ভাষণ ব্যক্তি বিশেষের দ্বীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ও দুরদর্শিতারই পরিচায়ক। কাজেই তোমরা নামাযকে দীর্ঘ কর ও বক্তৃতা ভাষণকে সংক্ষিপ্ত কর”। (মুসলিম)

রাসূল সা. ওয়াজ নসিহতের ক্ষেত্রে সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন মানুষ যেন বিরক্ত হয়ে না যায়।

অনেক বক্তা এমন আছেন যারা উপস্থিত লোকদের মন ও সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রেখেই বক্তৃতা শুরু করেন, কখন শেষ করবেন সে খেয়াল থাকেনা। এতে শ্রোতাগণ বিরক্ত বোধ করেন। এ অবস্থা যত ভাল নসিহত করাই হোক না কেন তা শ্রোতাগণ গ্রহণ করতে চায় না।

(৭) উপস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার করা ঃ

عن الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَعَظْتَنَا مَوْعِظَةَ مُوَدِّعٍ، فَاعْهَدْ إِلَيْنَا بِعَهْدٍ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا، وَسَتَرَوْنَ مِنْ بَعْدِي اخْتِلَافًا شَدِيدًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

"ইরবাদ ইবনে সারিয়া রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূল সা. জ্বালাময়ী ভাষার ভঙ্গীতে আমাদের উপদেশ দিলেন। এতে আমাদের সকলের মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমরা বললাম হে রসূলুল্লাহ! এটা তো বিদায়ী উপদেশের মত। কাজেই আমাদের আরো উপদেশ দিন তিনি বললেন ঃ আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। তোমরা আমার সুন্নাত এবং হেদায়াত প্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত অনুসরণ করা হবে তোমাদের জন্য অপরিহায্য কর্তব্য। এ সুন্নতকে খুব শক্ত ভাবে আকড়ে ধর। কেননা প্রত্যেকটি বিদয়াতই পথভ্রষ্টতা"। (আবু দাউদ)

(৮) উদাহরণ দিয়ে ওয়াজ করা ঃ

রাসূল সা. উদাহরণ দিয়ে মানুষদেরকে নসিহত করতেন যাতে করে সে কথাগুলো তাড়াতাড়ি মানুষের হৃদয়ঙ্গম হয় এবং চোখের সামনে ভেসে উঠে।

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ، لاَ رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ، رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الحَنْظَلَةِ، لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ»

"আবু মুসা আল আশ আরী রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেছেন যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কমলা লেবু। তার খুশবু মনোরম এবং স্বাদ চমৎকার। আর যে মুমিন ব্যক্তি কুরআন পড়েনা। সে খোরমা মতো। তাতে খুশবু নেই কিন্তু তার স্বাদ মিঠা। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে রাইহান ঘাস। খুশবু তার মনোরম কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়েনা সে মোকাম ফলের মত। তাতে কোন খুশবু নেই এবং তার স্বাদ ও তিক্ত"। (বুখারী)

(৯) হাতের ইশারায় ওয়াজ করা ঃ

রাসূল সা. যখন গুরুত্বপূর্ণ কোন নির্দেশ দেওয়ার ইচ্ছে করলে হাতের ইশারায় তা উপস্থাপন করতেন, যাতে করে শ্রোতাগণ এর গুরুত্ব অনুধাবন করে।

عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ

"আবু মুসা আশয়ারী রা. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন ঃ এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য প্রাচীর স্বরূপ। এর এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। এ কথা বলার সময় তিনি এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখালেন"। (বুখারী)

عَنْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى

"সাহল ইবনে সাদ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসূল সা. ইরশাদ করেন, আমি বেহেশতে ইয়াতীমদের এভাবে দেখাশুনা করব। এই বলে তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যম আঙ্গুলী দিয়ে ইশারা করলেন"। (বুখারী)

(১০) গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে নসিহত করা ঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَعْدَدْتَ لَهَا» قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلاَةٍ وَلاَ صَوْمٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قَالَ: «أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ»

"আনাস রা. থেকে বর্ণিত একজন মরুবাসী রাসূল সা. কে প্রশ্ন করল হে আল্লাহর রাসূল কিয়ামত কবে হবে? উত্তরে রাসূল সা. তাকে বললেন, কিয়ামতে জন্য তুমি কি প্রস্তুতী গ্রহণ করেছ? সে বলল আল্লাহ ও তার রসূলের ভালবাসা, তখন রাসূল সা. বললেন তুমি যাকে ভালবাস তার সাথে থাকবে"। (বুখারী)

(১১) হারাম জিনিসকে প্রকাশ্যভাবে উপস্থাপন করে ওয়াজ করা ঃ

রাসূল সা. হারাম ও নিষিদ্ধ বস্তু হাতে নিয়ে উপস্থিত জনগণের সামনে উপস্থাপন করে ওয়াজ করতেন, যাতে করে তারা নিশ্চিত হতে পারে এ জিনিসটি নিষিদ্ধ।

عن عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرِيرًا بِشِمَالِهِ، وَذَهَبًا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي، حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ»

"আলী ইবনে আবি তালিব রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল সা. ডান হাতে রেশমের বস্তু এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে হাত উঁচু করে বললেন, আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য এ দুইটি জিনিস হারাম, নারীদের জন্য হালাল"। (ইবনে মাযা)

এভাবে রাসূল সা. সকল শ্রেণীর লোকদেরকে ইসলামের পথে আহ্বান করেন।

(১২) ওয়াজের ক্ষেত্রে সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা

ইবনে মাসুদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম (সাঃ) আমাদেরকে ক্লান্তি থেকে বাঁচার জন্য উপদেশ দেয়ার ব্যাপারে কয়েক দিনের বিরতি দিতেন। আনাস থেকে বর্ণিত, নবী কারীম (সা.) বলেন, তোমরা সহজ পন্থা অবলম্বন কর, কঠিন কর না। আর সুখবর দাও, বিরক্তি সৃষ্টি কর না। আবু ওয়ায়েল রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ লোকদেরকে প্রতি বৃহস্পতিবার নসীহত করতেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আব্দুর রহমান, আপনি প্রতিদিন আমাদেরকে নসীহত করবেন বলে আমি আশা করি। তিনি বলেন এ ব্যাপারে আমাকে এই বিষয়টা বাধা দেয় যে আমি তোমাদেরকে ক্লান্ত করতে পছন্দ করি না।

নবী কারীম (সা.) আমাদেরকে যেমন ক্লান্তির ভয়ে বিরতি দিতেন, তেমনি আমিও তোমাদেরকে নসীহত করার ব্যাপাওে বিরতি দিতে চাই। (বুখারী কিতাবুল ইলম, হাদিস নং ৬৮,৬৯,৭০)

খতিবদের যোগ্যতা ও গুণাবলী

খতিবরা হলেন সাধারণ মানুষের সামনে একজন শিক্ষক ও ছাত্রের মত। সৈন্যদের মাঝে একজন সেনাপতির মত। সমাজের সকল স্তরের মানুষ তাদেরকে সম্মান করে এবং প্রত্যাশা করে ইসলামের যাবতীয় বিষয়গুলো খতিবদের কাছ থেকে সুষ্ঠ সমাধান পাবে। তাকে অবশ্যই এর মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। সেইজন্য তাকে মৌলিক কিছু গুণাবলী অর্জন করতে হবে। অন্যথায় তার ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা লোপ পেয়ে যাবে। তার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপঃ

১। কথার মধ্য কোন জড়তা থাকবে না। তার কথা হবে সুস্পষ্ট এবং কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকবে না। আল্লাহ তায়ালা কোন নবীকে মুখে জড়তা দিয়ে সৃষ্টি করেননি। কানা, বধির, বোবা কোন ব্যক্তিকে আল্লাহ নবী হিসেবে প্রেরণ করেন নি।

২। ভারসাম্যপূর্ণ পোষাক পরিধান। বাহ্যিকরূপে অপছন্দনীয় কোন পোষাক পরিধান না করা। কোন ময়লা কাটা, আটো-সাটো, দৃষ্টিকটু কোন পোষাক পরবে না। পরিষ্কার পোষাক পড়বে তবে খুব জাঁকজমকপূর্ণ যেন না হয়। সুগন্ধি ব্যবহার করবে কিন্তু অপচয় যেন না হয়। দেশের সংস্কৃতি ও সমাজের লোকদেও সাথে মিল রেখে পোষাক পরিধান করবে এবং শরীয়তের সীমারেখা বজায় রাখবে।

৩। খুতবার সময় উত্তেজিত হয়ে উঠা-বসা করা যাবে না। খুতবার সময়ে উঠা-বসা, দাঁড়ানো সবকিছুতে ভারসাম্য থাকতে হবে। ইশারা-ইঙ্গিত, হাত নাঁড়াচাড়া বা শরীরের অঙ্গভঙ্গি এমন করা যাবে না যাতে ব্যায়ামকারী ও নাটককারীদেও মত মনে হয়।

৪। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় খুতবা দেয়া কারণ শ্রোতাদেও মধ্য অনেক ধরণের লোক থাকে। সকলের বোঝার উপযোগী শব্দ ও ভাষা দিয়ে নসীহত করা।

৫। সুসংবাদ ও ভয় প্রদর্শন করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা যাবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, **আল্লাহ বলেন, আল্লাহর পথে হিক-মত ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আহবান করুন।** (সূরা নাহল-১২৫)

৬। জনগণের অবস্থান ও সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখা। ওয়াজ করার ক্ষেত্রে সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা। খুতবা ও বক্তৃতাকে এত লম্বা করা যাবে না যাতে মানুষ বিরক্ত বোধ করে। কারণ মানুষের বিরক্তির সময়ে যত ভাল কথাই বলা হোক না কেন সে এটা গ্রহণ করতে চায় না।

৭। যে জিনিসের দাওয়াত দেয়া হবে সেই বিষয়ে বক্তাকে বাস্তব আমল করতে হবে। উমর রা. একদিন মসজিদে খুতবা দিয়ে তার পরিবারের কাছে এসে বললেন, আজকে আমি উমুক বিষয়ে খুতবা দিয়েছি। সুতরাং তোমরা সেই বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে পালন করবে। কারণ কাক যেভাবে মাংসের দিকে তাকিয়ে থাকে তেমনিভাবে যারা মানুষকে নসীহত করে তাদের দিকে মানুষ সেইভাবে তাকিয়ে থাকে।

৮। অধিক জ্ঞানর্জন করতে হবে। কুরআন, হাদিস, সিরাতে রাসূল (সা.), সিরাতে সাহাবা, ইসলামী আকীদা, শিরক, বিদয়াত ও ইসলাম এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা এই সকল বিষয়ে তাকে গভীর জ্ঞানার্জন করতে হবে।

৯। বক্তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে সব সময় যেন একই ওয়াজ বারংবার না করা হয়। আকীদা, ইবাদত, মুয়ামেলাত এই সব বিষয় পর্যায়ক্রমে ওয়াজ করা এবং আশাবাদ ও ভয় প্রদর্শন দুইটার মধ্য সমতা রক্ষা করা।

১০। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বর্তমান বিশ্ব, মুসলমানদের অতীত ও সমসাময়িক বিষয়ের উপর জ্ঞান রাখা।

১১। পুরাতন যুগের তৈরী খুতবাকে বাদ দিয়ে বিষয়ভিত্তিক খুতবা তৈরী করে উপস্থাপন করা।

মুজাদালা ঃ

مجادلة শব্দের অর্থ যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও দলীলের মাধ্যমে একে অপরের সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হওয়া, এবং অন্যের সামনে সঠিক দলীল উপস্থাপন করা।

مجادلة শব্দটি جادل t مجادلة শব্দ থেকে উদ্ভুত। অর্থ আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক।

مجادلة ঃ বলা হয় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য উপযুক্ত ও যুক্তিপূর্ণ প্রমাণ ও দলীল পেশ করা।

অন্য অর্থে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের উপস্থাপিত অভিযোগকে উপযুক্ত দলিলের মাধ্যমে খণ্ডন করা।

পবিত্র কুরআনের ঘোষণা হলো ঃ

وجادلهم بالتى هى أحسن অর্থাৎ উত্তম পন্থায় তর্ক বিতর্ক কর। তর্ক বিতর্ককে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে।

(১) একটি উত্তম পন্থায় যা উপরের আয়াতে উল্লোখ করা হয়েছে।

(২) বাতিল পন্থায় ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ﴾

"তারা মিথ্যা তর্ক বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিল, যেন সত্য ধর্মকে ব্যর্থ করে দিতে পারে"। (সূরা গাফের ঃ ৫)

কুরআনের উত্তম পন্থায় তর্ক বিতর্ক করার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আর ل اد ج শব্দটি কুরআনে ২৯ বার এসেছে।

যেমন ঃ

(ক) তর্ক বিতর্ক করা মানুষের প্রকৃতি ঃ আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا﴾.

"সমগ্র সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষ সর্বাধিক তর্ক প্রিয়"। (সূরা কাহাফ ঃ ৫৪)

﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾.

"তারা বলল ঃ হে নুহ! আমাদের সাথে আপনি বেশী বেশী তর্ক করছেন"। (সূরা হুদ ঃ ৩২)

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾

"তোমরা আহলে কিতাবদের সাথে উত্তম পন্থা ব্যতীত তর্ক-বিতর্ক

করবে”। (সূরা আনকাবুত ঃ ৪৬)

উপরের আয়াত সমূহে প্রমাণ করে যে, তর্ক বিতর্ক উত্তম পন্থায় করতে হবে, এবং অত্যন্ত ভদ্রচিত্তে নরম ও মিষ্টি ভাষায় কথা বলতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল সা. কে হিকমত, উত্তম নসিহত ও উত্তম পন্থায় তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে সকল মানুষদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষ বিভিন্ন চিন্তাধারা ও বিভিন্ন আকীদার দিক থেকে ৩ ভাগে বিভক্ত।

প্রথম ঃ একদল যাদের অন্তর প্রকৃতিগতভাবে সত্য দাওয়াত গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত, যখনই তাদের সামনে ইমানের দাওয়াত পেশ করা হয় তারা কোন প্রকার সন্দেহ ব্যতীতই তা গ্রহণ করে। যার উদাহরণ ইসলমী দাওয়াতের প্রথম কাতারের ব্যক্তিবর্গ। তাদের প্রতি দাওয়াত হবে হেকমত সহকারে।

দ্বিতীয় ঃ দ্বিতীয় দলের সংখ্যা অধিক, তারা প্রথম দলের মত এবং প্রকৃতগতভাবে উত্তম চরিত্রের দিক থেকে সমপর্যায়ের নয়। তারা সর্বদা হক ও বাতিলের মাঝখানে দ্বিধাদ্বন্দ্বে আচ্ছন্ন। তাদেরকে উত্তম ওয়াজ নসিহত, সুন্দর কথার মাধ্যমে সত্য পথে ফিরে আসার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। অসৎ পথের পরিণতি সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করতে হবে এবং তারা যেন গুনাহ ও অসৎপথে ডুবে আছে সে কথা সুস্পষ্ট করে সিরাতুল মুসতাকীমের পথে ফিরে আসার আহ্বান করতে হবে ও তাদের যাবতীয় সন্দেহ দুরিভূতি করে মুমিন ও আম্বীয়াদের দলে অন্তূক্ত করার চেষ্টা করতে হবে, তাদেরকে দাওয়াত দিতে হবে উত্তম নাসিহতের মাধ্যমে।

তৃতীয় ঃ তৃতীয় দল যারা জাহেলিয়াতের মধ্যে নিমজ্জিত। সর্বদা গুনাহের কাজে লিপ্ত, বাতিলের উপর অটল, এবং সর্বদা হকের দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির কাজে ব্যস্ত, তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ

﴿بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ - قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ - لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾

“বরং তারা বলে যা পূর্ববর্তীগণও বলেছিল। তারা বলে আমাদের মৃত্যু ঘটিলে এবং মুত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও কি আমরা পুররুত্থিত হব? আমাদেরকে এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, এবং আমাদের অতীতে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেও, উহাতো সেকালের উপকাথা ব্যতীত আর কিছুই নয়”। (সূরা মুমিনুন ঃ ৮১-৮৩)

এ ধরনের লোকদেরকে শুধু কুরআনের বাণী ও উত্তম ওয়াজের সাহায্যে দাওয়াত দিলে কোন ফল হবেনা, বরং তাদের সামনে উত্তম বাণী ও যুক্তিপূর্ণ দলীল উপস্থাপন করে দাওয়াত দিতে হবে। যাদেরকে দাওয়াত দেওয়া হবে তারা তিনটি দলে বিভক্ত। তাদের এক দলকে হিকমত, একদলকে ওয়াজ নসিহত আর একদলকে যুক্তিপূর্ণ দলীল উপস্থাপন করে দাওয়াত দিতে হবে।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে দাওয়াত গ্রহণকারী দলকে হিকমতের সাহায্যে দাওয়াত প্রদান করলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। যেমন দুগ্ধপানকারী শিশুকে পাখীর মাংশ ভক্ষণ করতে দিলে তার পেট নষ্ট হয়ে যায়।

হিকমতের সাহায্যে দাওয়াত গ্রহণকারীদেরকে হিকমতের সাহায্যে দাওয়াত না দিয়ে যুক্তিপূর্ণ দলীল পেশ করে দাওয়াত দেওয়া হলে তারা তা প্রত্যাখান করবে। যেভাবে একজন শক্তিশালী ব্যক্তিকে বার বার দুধ পান করতে দেওয়া হলে সে তা প্রত্যাখ্যন করে। তেমনিভাবে যুক্তিপূর্ণ দলীল যদি কুরআনের উপস্থাপিত উত্তম পন্থায় উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে তার অবস্থা হবে একজন মরুবাসীর মত যে সর্বদা খেজুর খেয়ে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত। তার সম্মুখে যবের রুটী দেওয়া হলে সে কখনও তা গ্রহণ করবে না। আবার যারা যবের রুটী খেতে অভ্যস্ত তাদেরকে সর্বদা খেজুর খেতে দিলে সে তা গ্রহণ করবে না। আল্লাহ পবিত্র কুরআনে রাসূল সা. কে হিকমত, উত্তম নসিহত ও যুক্তিপূর্ণ তর্ক বিতর্কের মাধ্যমে দাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন। উহা সর্বকালে সকল অবস্থায় প্রযে-জ্য। কারণ আল্লাহ দাওয়াত দানকারীদের অবস্থা ভাল করে জানেন, তিনি মানুষদেরকে বৃদ্ধি ও বিবেকের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে পার্থক্য করে সৃষ্টি করেছেন।

রাসূল সা. কাফেরদের সাথে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করে দাওয়াত দিয়েছেন। একবার তিনি সূরা ফুচ্ছেলাত তেলাওয়াত করে তাদের জবাব দেন।

বিতর্ককারীর বৈশিষ্ট্য ঃ

১। নিয়ত ঃ তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে খালেছ নিয়ত থাকতে হবে। নিজের শ্রেষ্টত্ব প্রতিষ্ঠা ও অন্যের উপর বিজয় অর্জনের মানসিকতা পরিহার করতে হবে। সর্বদা লক্ষ্য থাকবে সত্য উদঘাটন ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

২। স্থানকাল ও মানুষের প্রকারভেদে তর্ক করতে হবে। যেখানে সেখানে যখন তখন তর্ক বিতর্কে জড়িত হওয়া লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী।

৩। জ্ঞান ঃ যে বিষয় তোমার জানা নেই সে বিষয়ে তর্ক বিতর্কে জড়িত হওয়া উচিৎ নয়। আল্লাহ বলেন ঃ

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

“যে বিষয় তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়োনা। নিশ্চয়ই কান, চক্ষু, ও অন্তকরণ এদের প্রত্যেকটিই জিজ্ঞাসিত হবে”। (সূরা ইসরা ঃ ৩৬) তর্ক-বিতর্কের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর উপর পরিপূর্ণ ইলম থাকতে হবে, এবং যুক্তিপূর্ণ দলিলের মাধ্যমে তা উপস্থাপন করতে হবে।

৪। নিজের অক্ষমতা স্বীকার করে নেয়া ঃ যে বিষয় জানা নেই সে বিষয় প্রশ্ন করা হলে স্বীকার করে নেওয়ায় কোন দোষ নেই। ইমাম মালেককে ৮৪ টি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, তন্মধ্যে তিনি ৩৩টি প্রশ্ন সম্পর্কে বলেন আমি জানিনা।

৫। তর্ক বিতর্কের ক্ষেত্রে দুর্বল বর্ণনার আশ্রয় না নেওয়া।

৬। কথা দীর্ঘায়িত করা যাবেনা ঃ নিজের বক্তব্য দীর্ঘায়িত করা যাবে না, এবং সর্বদা সময়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। নির্দিষ্ট করে দেওয়া না হলে নিজেই নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। ফযরের পরে যদি মসজিদে কথা বল, তবে মানুষের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে কয়েক মিনিটে তা শেষ করতে হবে। আল্লাহ মানুষকে একটি মাত্র

জবান ও দুইটি কান দিয়েছেন, যাতে করে সে বলার চেয়ে বেশী শ্রবণ করে। বক্তা, ও তর্ক বিতর্ককারীর জন্য দাওয়াতের ক্ষেত্রে দীর্ঘ বক্তব্য, লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভবনা বেশী থাকে।

৭। ভুল স্বীকার করার মানসিকতা থাকা। নিজের মতের উপর অটল থাকা উচিৎ নয়, এতে সত্য জিনিস গ্রহণ করা যায় না। একজন মুসলমান সর্বদা সত্য অন্বেষণ করবে। সে কোন ব্যক্তি, কোন দল ও কোন মতের উপর অটুট থাকবে না। তর্ক-বিতর্ক করার সময় কোন বিষয়ে অটুট না থেকে যেটা সত্য তা গ্রহণ করা উচিৎ।

৮। তর্ক বিতর্কের সময় দ্বিতীয় পক্ষকে সম্মান করা এবং সে যে ধর্মাবলম্বনকারী হোক না কেন, তাকে যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা। বিতর্ককারী প্রতিপক্ষ যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, বয়ঃবৃদ্ধ, পদমর্যাদাশীল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে থাকেন তার মর্যাদা অনুযায়ী সম্মান দেওয়া।

৯। রাগ করা যাবেনা ঃ প্রতি পক্ষ যদি তোমার মতের সাথে একমত না হয় তাহলে রাগ করা যাবেনা।

১০। উদাহরণ দিয়ে কথা বলা ঃ সফল যুক্তিবাদী উদাহরণ উপস্থাপন করে যুক্তির সাহায্যে কথা বলে। ইমাম গাজ্জালী আল্লাহর কুদরত ও সৃষ্টি সম্পর্কে একটি উদাহরণ উস্থাপন করে বলেঃ রেশম গাছের পাতার রং ও খাদ্য এক প্রকারের। রেশমের পোকায় যখন খায় তখন তার থেকে রেশম বের হয়। মৌমাছি যখন খায় তার থেকে মধু বের হয়। ছাগল ও গরু যখন খায়, তখন মলমূত্র বের হয়। হরিণ যখন খায় তা থেকে মিশক বের হয়, অথচ জিনিস একটি। তোমরা দেখ আল্লাহ কত উত্তম স্রষ্ঠা। উক্ত উদাহরণটি একটি বাস্তব পদ্ধতি, যা মানুষের অন্তরকে আকৃষ্ট করে হৃদয়ের অনুভূতিকে জাগ্রত করে। (ড. মানেহ হাম্মাদ জুহানী, ফি অচুল আল-হেওয়ার (সউদী আরব, ওয়ামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৫) পৃ ঃ ৮১)

১১। যুক্তি দিয়ে উত্তর দেয়া ঃ প্রখ্যাত একজন ইসলামী চিন্তাবিদ একজন নাস্তিকের সাথে বিতর্ক সভার আয়োজন করে। সময়মত জনসমাবেশে নাস্তিক উপস্থিত হন। কিন্তু উক্ত ইসলামী চিন্তাবিদ অনেক দেরীতে উপস্থিত হন। নাস্তিক ভদ্রলোক বললঃ এত দেরী করে কেন আসলেন? আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেছেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ আমার আসার পথে একটি নদী। পারাপারের উপায় ছিলনা। অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি আমার সম্মুখে একটি বৃক্ষ গজাচ্ছে। এ বৃক্ষটা অল্প সময়ে বড় হয়ে গেল। অতঃপর আসলো একটা কুড়াল। এই কুড়ালটি গাছটিকে কেটে ফেলল। তারপর দেখলাম আসলো করাত। করাত গাছটিকে চিরে তক্তা বানিয়ে ফেলল। অতঃপর পেরেক হাতুড়ী ইত্যাদি এসে গেল। আর তৈরী হয়ে গেল নৌকা। সে নৌকাটি আমার সম্মুখে চলে আসলো এবং সে নৌকা দিয়েই আমি পার হয়ে আসলাম। এতে একটু দেরী হয়ে গেল। নাস্তিক চিৎকার দিয়ে বলে উঠলো সাহেব আপনি পাগল হয়ে গেলেন? এতাগুলো কাজ কিভাবে নিজে নিজে হয়ে গেল। চিন্তাবিদ বললেন, এটাই হচ্ছে আপনার বিতর্ক সভার উত্তর। আপনি কিভাবে চিন্তা করতে পারলেন যে, এই বিশাল সৃষ্টি জাগতে গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী, আলো-বাতাস, গাছ-পালা, মানুষ, পশু-পাখি অসংখ্য জীব-জন্তু এত কিছু নিজে নিজেই তৈরী হয়ে গেল? উত্তর শুনে নাস্তিক হতভাগ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করল এর পিছনে একজন শক্তিশালী সুনিপূর্ণ কারিগর অবশ্যই আছেন। আর তিনিই হচ্ছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ও তার একমাত্র মালিক। (হাফেজ নেছার উদ্দিন আহমদ, ইসলামী দাওয়াহ সিরিজ-১ ঢাকা, আগারগাও, পৃ ঃ ২৯)

গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. রউফ সালাভী, আদ-দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া ফি-আহদে আল মক্কী, জামেয়া, কাতার, ১২০২হিঃ।

২। শেখ মুহাম্মদ খিদরী হোসাইন, আদ-দাওয়াহ ইলাল-ইসলাহ, বৈরুত, ১৯৮৫ ইং।

৩। আহম্মদ গালুস, আদ-দাওয়াহ-আল-ইসলামিয়া-অসুলহা অসায়েলুহা, কায়রো, দারুল কুতুব আল-মিশরী, ১৩৯৯।

৪। আবু বকর যেকরী, দাওয়াহ ইলাল-ইসলাম, মিশর, ১৪০৩ হিঃ।

৫। তাফসীর ইবনে কাছির, বৈরুতঃ দারুল মায়ারেফ, ১৪০৩।

৬। ইমাম নবুবী, রিয়াদুস সালেহীন, বৈরুত ঃ দারুল মামুন, ১৪০২।

৭। শেখ আবু যাহরা, আদ-দাওয়াহ ইলাল-ইসলাম, কায়রো ঃ দারুল ফিকরুল আরবী, ১৯৭৩ ইং।

৮। আবু বকর জাসসাস, আহকামুল কুরআন, কুতুবুল আরবী।

৯। ইবনে কাছির, আল-বেদায়া অন নেহারা, বৈরুত ঃ দারুল কুতুবুল ইসমীয়া, ১৪০৫ হিঃ।

১০। হুসাইন মুহাম্মদ ইউসুফ, সাবিল-আদ-দাওয়াহ বৈরুত ঃ দারুল ইতেসাম, ১৩৮০ হিঃ।

১১। শেখ মনসুর আলী নাসেফ, আচ-তায, জামেউল অছুল, বৈরুতঃ দারুল এহইয়ী, ১৮৬২।

১২। ইবনে হিশাম, সীরাতুন-নবুবীয়া, কায়রোঃ মকতবাতুল-কুল্লিয়াতুল আযহারীয়া।

১৩। ইবনে সাইয়েদ আন-নাস, উয়ুনুল আসার, বৈরুত ঃ দারুল জীল, ১৯৭৪ ইং।

১৪। ড. আকিল আব্দুল্লাহ আল-মিশরী, তারিখ-আদ-দাওয়াহ আল-ইসলামীয়া, সৌদী আরব, দারুল মদীনা, ১৯৮৭।

১৫। বায়হাকী, দালায়েল অন-নবুয়া, বৈরুতঃ মাকতুবাতুল ইসলামী, ১৯৮০ইং।

১৭। ড. আহমদ সালাভী, আর-রেক আল-মওকেফুল ইসলাম ফিহে, বৈরুত, দারুল মালাইন, ১৯৮২। আবদুস-সালাম হারুন, তাহযীব সীরাত ইবনে হিশাম, বৈরুত, আল-মুজমা আলুসী, ১৯৭৩ ইং।

লেখক: প্রাক্তন সভাপতি, দা'ওয়াহ এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ও আল ফিকহ বিভাগ এবং প্রাক্তন ডীন, থিওলজী এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

চেয়ারম্যান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।

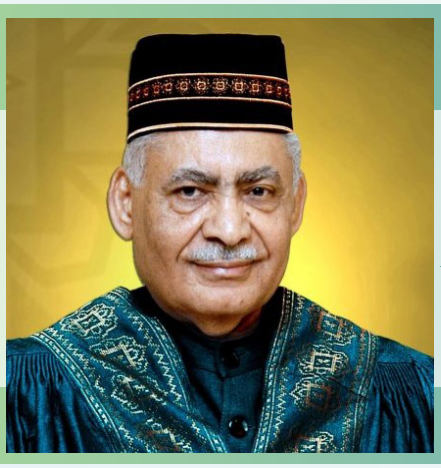

বিখ্যাত ইসলামী দার্শনিক ও চিন্তক
ডঃ আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মান

মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম আজাদী

আমার চিন্তার জগতকে যারা আলো ঝলমলে করে দিয়েছেন, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে আমার শিক্ষক প্রফেসর এমিরিটাস ডঃ আব্দুল হামিদ আবু সুলায়ামান অন্যতম। আমি তাকে ঘনিষ্ঠ ভাবে পেয়েছি, তাকে কাছে পেয়েছি, এবং তার কথা আমার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মালয়েশিয়াতে থাকাকালীন ২বছর ৫ মাস শুনে শুনে ঋদ্ধ হয়েছি। আমি তার সাথে দুইবার সাক্ষাৎ করেছি। একবার আমার পিএইচডিতে সাব্জেক্ট পরিবর্তনের বিষয়ে পরামর্শ নেবার জন্য। আরেকবার তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেয়ার আগে। ওই সময় আনোয়ার ইবরাহীমকে ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টারের পদ থেকে অপসারণ করেন তুন মাহাথির মুহাম্মাদ এবং তাকে যখন জেলে প্রেরণ করা হয়। সে সময় আমি ডঃ প্রফেসর আবুল হাসান সাদেক, ডঃ ইউসুফ আলি ও মাজহারুল হক তপন ভাইয়ের সাথে আনোয়ার ইবরাহীমের বাসায় ডঃ ওয়ান আযীযাহ ম্যাডামকে সমবেদনা জানাতে যাই। সেখানেও দেখা হয় আমাদের রেক্টর ও তার পরিবারের সাথে।

আমি ১৯৯৬ সালে যখন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করতে যাই, তখন ছিলো এর পূর্ণ যৌবন কাল। বিশ্ব সেরা অনেক ইসলামী চিন্তাবিদকে আমি সেখানে পাই। যাদের মধ্যে তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আব্দুল্লাহ গুল ছিলেন, গিনিয়ার মন্ত্রী কুতুব সানো ছিলেন, বিশ্ব সেরা ইসলামী মনোবিজ্ঞানী ডঃ মালেক বদরি ছিলেন, মালয়েশিয়ার সেরা আইনবেত্তা তুন ইবরাহিমসহ একঝাক তারকাগণ জ্বলজ্বল করে জ্বলছিলেন সেখানে। যাদেরকে ডঃ আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মানের মত মানুষেই একত্রিত করতে পেরেছিলেন।

তিনি ১৯৩৬ সালে মক্কায় জন্ম গ্রহন করেন। সেখানেই প্রাথমিক, সেকেন্ডারি ও হাইয়ার সেকেন্ডারি শেষ করে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে বিবিএ ডিগ্রী নেন ১৯৫৯ এ। একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ তে তিনি এমবিএ গ্রহণ করেন। এরপরে তিনি আমেরিকায় যান উচ্চশিক্ষা গ্রহণার্থে। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনেক সুনামের সাথে পিএইচডি ডিগ্রি নিয়ে সাউদিতে ফিরে আসেন ১৯৭৩ এ। সাউদিতে তার ফিল্ডে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে প্রভাবশালী, ফলে তাকে অনেক গুলো কাজ একসাথে করতে হয়। বাদশাহ ফয়সাল (রহ.) ও চাচ্ছিলেন এই ধরনের প্রতিভা। এইজন্য তাকে তিনি প্রথম দেশের প্লানিং কমিশনের প্রধান করে দেন। সেই সাথে কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় (রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়) কে বিশ্বমানে আনতে তাকে কাজ দেন। তিনি সেখানের পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশানের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন, তবে পরে এই ফ্যাকাল্টিরই রাস্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নেন। এর সাথেই তাকে দায়িত্ব পালন করতে হয় WAMY (World Assembly of Muslim youth) প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে। রিয়াদে আন্তর্জাতিক স্কুল আল মানারাতের প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। আমেরিকার ট্রিপল আইটি এরও প্রতিষ্ঠা করেন। সে সাথে কানাডা ভিত্তিক মুসলিম সোশাল সাইন্টিস্টদের সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। ছিলেন হাফ ডজন আন্তর্জাতিক গবেষণা ম্যাগাজিনের সদস্য। ওআইসি সারা বিশ্বে ৩টা বড়ো বড়ো উঁচু মানের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করে। যার একটা হয় মালেয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর। তিনি সে সময়ের ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইবরাহিম ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এ জন্য তাকে প্রায় জোর করেই আনা হয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর করে। তিনি ১৯৮৮ সালে সেখানে যান ও ১৯৯৯ সালে সেখান বিশ্ববিদ্যালয়কে অনেক উন্নত মানে এনে পরে চাকুরি ছেড়ে মাতৃভূমিতে চলে আসেন। মজার বিষয় হলো তিনি এতো বড়ো দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে কোন বেতন তো নিতেন না, বরং কোটি কোটি ডলার তিনি এখানে দান করেছেন।

আজ ১৮-০৮-২০২১ তিনি মক্কাতে ইন্তেকাল করেন। তার মেয়ে মুনা আব্দুল হামিদের টুইটারে আমি প্রথমে এটা জানতে পারি, পরে আমাদের আইআইইউএম এর হোয়াটসআপ এলামনাই গ্রুপের মাধ্যমে নিশ্চিত হই। আগামী পরশু ১১ই মুহাররাম মুতাবিক ২০শে আগস্ট জুমুয়ার পর কাবা শরীফে তার সালাতুল জানাজাহ শেষে দাফন হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন, ভুল ত্রুটি ক্ষমা করুন, ও শোক সন্তপ্ত পরিবারকে এই শোক কাটিয়ে ওঠার তাওফীক দান করুন।

আমরা যারা সাউদিতে পড়েছি তাদের অধিকাংশ ইসলামী জ্ঞান নিয়েই পড়ার কারণে ঐ দেশের শায়খদের কথা আমরা বেশি জানি এবং দেশের ইসলামী জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে তাদের অবদানের কথা আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু ওই দেশে অন্যান্য জ্ঞানে যারা ইসলামিক দার্শনিক হিসেবে প্রথিতযশা তাদের খবর খুবই কম জানি। আজ আমি তাই আমার শিক্ষক আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মানের ইসলামী জ্ঞানের অবদান সম্পর্কে জানানো দায়িত্ব মনে করছি।

ইসলামী জ্ঞান বলতে যারা আক্বীদাহ, কুরআন, হাদিস, ফিকহ ইত্যাদি বুঝান তারা ইসলামী জ্ঞানের ঠিক রূপরেখা জানেন বলে মনে হয় না। যে জ্ঞান বিশ্ব চালায়, সমাজ ঘোরায়, রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে, সভ্যতা বিনির্মাণ করে, সংস্কৃতিতে আবহ তৈরি করে, মন রাজ্য তোলপাড় করে, আলোকিত জাতি বানায়, বিশ্বসেরা করে তা সবটাতেই ইসলাম এক-সময় নেতৃত্ব দিয়েছিলো। কিন্তু ঐ সবে এখন মুসলিম জাতি পর্যুদস্ত। ১৯৫০ এর পর দ্বিতীয় বিশ্ব পরবর্তী নতুন বিশ্ব ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে তখন মুসলিমরা ছিলো খেলাফত হারা, ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হারা, পণ্ডিত হারা এবং বিশেষজ্ঞ হারা। ওই সময়ে আব্দুল হামিদ আবু সুলায়মানদের উত্থান এবং তারাই হয়ে পড়েন বিশ্ববিদ্যলয়গুলোতে ইসলামী দর্শনের পরিচয় ঘটানোর মূল চালিকা শক্তি।

আমি মালয়েশিয়ায় ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত ছিলাম। সে সময় নিজ হাতে দেওয়া তার দুইটা বই আমার কাছে গুছানো আছে। একটা হলো মুসলিম চিন্তার পুনর্গঠন কেন্দ্রিক, "আযমাতুল আক্বল আলমুসলিম" অন্যটি আধুনিক মানস গঠনে একজন মুসলিমকে যে সব বই পড়া উচিত তার একটা নির্ঘণ্ট "দালীল মাকতাবাহ আল উসরাহ আল মুসলিমাহ।" তার প্রতিটা অনুষ্ঠান আমি শুনতাম, কারণ তার সাথে ছিলো আমার দুই দিকের সম্পর্ক। তিনি ছিলেন রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো অধ্যাপক, আমি ছিলাম ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরানো ছাত্র। আর খাঁটি ইসলামী চিন্তা, বিশেষ করে আল কুরআন ও সহীহ হাদিসের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুবই স্বচ্ছ ধারণার অধিকর্তা। এই সময়ে তার যে সব দর্শন আমাকে ঋদ্ধ করে, ও আমার চিন্তার জগতে প্রভাব ফেলে সেগুলো নিচে বর্ণনা করছি। আমি আশা করছি আমার পাঠকগণ উপকৃত হবেন এবং আমার বন্ধুরা আরও ব্যাপক লিখে আমার উস্তাযের জ্ঞানগুলো প্রচারে কাজ করবেন:

এক

গত শতকে যারা মুসলিম উম্মার চিন্তার রাজ্যে কাজ করা শুরু করেন, তারা প্রথমেই "ক্বাদায়া আল উম্মাহ আলইসলামীয়্যাহ" তথা মুসলিম উম্মাহর মূল সমস্যাগুলো নির্ণয় করতে প্রয়াস পান। তারা প্রথমেই দেখতে পান, মুসলিম ইন্টেলেকচুয়াল এখন মারাত্মক ভাবে অন্ধকারে। এই ব্যাপারেই তিনিই প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন, "আযমাতুল আক্বল আল মুসলিম" নাম দিয়ে। এতে তার বক্তব্যের মূল বিষয় হলো, ইসলামী বিশ্বে অর্থের এখন অভাব নেই। আধ্যাত্মিকতা ও মূল্যবোধের প্রাচুর্য আছে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে আজকের বিশ্ব জ্ঞান-বিজ্ঞানে, চিন্তা- দর্শনে, আবিষ্কার- উদ্ভাবনায়, জ্ঞানের মৌলিকতা ও সৃষ্টিশীলতায়, লেখা-প্রকাশনায়, তথা আধুনিক সভ্যতার সব কিছুতেই যেন পিছিয়ে পড়েছে মুসলিমরা।

তিনি ভাবতেন, যে সভ্যতা ও দর্শন একসময় শতাব্দীর পর শতাব্দী ছিলো নেতৃত্বদানকারী। যাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিলো সারা দুনিয়ার অনুকরণীয়, যাদের অর্থ ব্যবস্থা ছিলো সারা বিশ্বের আবে হায়াত, যে সমাজ দর্শন ছিলো সারা দুনিয়ার পরিবর্তনের অনুঘটক তারা এমন হলো কেন?

তিনি মনে করেন, যে ইসলামী দর্শনের প্রধান উপাদান হলো, তাওহীদ, মেন্টরিং, সারা বিশ্বের জন্য মানানসই জ্ঞান এবং বিশ্ব পরিচালনায় কাজে লাগার মত তত্ত্ব বা থিউরি। অথচ আজ সেই জ্ঞান ও দর্শনের অধিকারীরা বিশ্ব সংসারে আজ পাদটীকা হয়ে গেছে, শতধা বিভক্ত হয়েছে, পিছিয়ে পড়েছে, এমনকি তাদের সার্বিক স্টান্ডার্ড এখন বৈশ্বিক স্টান্ডার্ডের অনেক নিচে।

মালয়েশিয়ায় এক বক্তৃতায় তিনি একবার বলেছিলেন, যে ইসলামী সভ্যতার প্রথম জেনারেশান ছিলো

مُتَتَلْمِذُونَ عَلَى الْقُرْآنِ، وكَانَ لَدَيْهِمْ نَمُوذَجُ النُّبُوَّةْ

অর্থাৎ কুরআনের ছাত্র ও নবুওয়াত ছিলো তাদের রোল মডেল। এর অর্থ তারা এই নয় যে, কুরআনের আয়াত দিয়ে কথা বলতো, হাদিসের কোটেশান দিয়ে আলাপ করতো। বরং তাদের জ্ঞানের আকর ছিলো কুরআন ও হাদিসে রসুল (সা.)। তিনি উদাহরণ দেন, সায়্যিদুনা উমার (রা.) একবার মিশরের গভর্নর আমর ইবনুল আসকে (রা.) ধমক দিয়ে বলেছিলেন, مَتَى اِسْتَعْبَدْتُمُ النَّاسَ، وقَدْ وَلَدَتْهُم أُمَّهَاتُهُم أَحْرَاراً মানে "কবে থেকে তুমি মানুষকে দাস বানাতে শুরু করলে, অথচ তাদের মায়েরা তাদেরকে স্বাধীন হিসেবে জন্ম দিয়েছেন।" এই কথা কুরআন হাদিসে কোথায়ও নেই। অথচ যা তিনি বললেন তা হয়ে গেলো ইসলামের মূল শিক্ষার একটি। এইভাবে তারা পৃথিবীর স্রোত ধারা পরিবর্তন করেছিলো, জীবন-যাপন পদ্ধতি চেঞ্জ করেছিলো, সভ্যতা তৈরি করিছিলো এমন শক্ত ভিতের উপর যা শত শত বছর ধরে টিকে ছিলো। তারা আরবি ভাষার যেমন উৎকর্ষ সাধন করেছিলো, তেমন ভাবে নানা ভাষায় ও সংস্কৃতিতেও ঝড় নিয়ে এসেছিলো। সবচেয়ে মজার কথা হলো সে সময়ের সেরা দুই শক্তি রোম ও পারস্যের প্রতিটা চ্যালেঞ্জের তারা জবাব শুধু দেয়নি, তাদেরকে হাত ধরে নতুনের কাছে নিয়ে এসেছিলো।

দুই

তিনি সেই উন্নত সভ্যতার চৈন্তিক স্খলন ও দার্শনিক বিপর্যয়ের বিচ্যুতির কারণ হিসেবে তিনি ৫টি বিষয় নিয়ে এসেছেন। যথা

(ক) ইসলামের মূল শিক্ষার সাথে জ্ঞানগত, আক্বীদাহগত, আমলগত এমন কিছুর সংমিশ্রন ঘটেছে যা ইসলামের মূল জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা ইলম ও হিকমাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় মুসলিম উম্মাহকে। কালক্রমে এভাবে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপরেও ছাপ পড়ে যায়। অথবা তাকে গণ্ডিবদ্ধ করা হয় হয়ত কোন মাযহাবের মধ্যে, নতুবা কারো চিন্তা দর্শনের মাঝে কিংবা কোন রাজনৈতিক শক্তির নিগড়ে। ফলে নবীর (সা.) যুগের সেই স্বচ্ছ প্রস্রবনের অনেকাংশ শেষ হয়ে যায় সীমাবদ্ধ কুয়ায়।

(খ) ক্রমে ক্রমে ইসলামী চিন্তা দর্শন যেন ইতিহাস হয়ে গেল এবং জ্ঞান গবেষণায় মুসলিম মানস খুব দুর্বল হলো। নতুন ভাবনা, নতুন জগতের উপযুক্ত করে ইসলামের কথা গুলো সাজানোর ক্ষেত্রে উম্মাহ পিছিয়ে গেলো। যে চিন্তায় একেকজন সাহাবি দুনিয়ার একেক প্রান্তে যেয়ে জগতকে রাঙিয়ে ছিলেন, যে চিন্তার ঢেউ বড়ো বড়ো ইমামগণ ইজতিহাদের সাগরে তুলতে পেরেছিলেন, তা যেন ক্ষয় হয়ে যেতে থাকে, দুষ্প্রাপ্য হয়ে যেতে থাকে, বদ্ধ খাঁচায় তড়পাতে থাকে। উম্মাতের মাথায় এমনও ঢুকে যায় যে, ইমামগণের পর ইজতিহাদের দরজা আর খোলা নেই। যে যা বলবে তা ইমামদের বলয়েই থাকবে, নতুন কিছু আর হবে না।

(গ) তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুসরণ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে, যাকে অন্ধভাবে অনুগত্য করা হয়, তার কথা নবীর (সা.) কথার বিপরীত হলেও নবীর (সা.) কথাকে অগ্রাহ্য করতে শেখানো হতে লাগলো। নবীর (সা.) চেয়ে অন্য ব্যক্তি, দল, স্কুল অফ থট সবাইকে বড়ো করে দেখতে হলো। তাতে উম্মাহের অঙ্গ শতধা বিভক্ত হলেও যায় আসে না যেন!

(ঘ) হিকমাহকে উম্মাহের জীবন থেকে ছুড়ে ফেলা হলো। হিকমাহর মূল প্রণোদনা ছিলো কুরআনের কথাগুলোর যথাযথ প্রয়োগ করতে শেখা। নতুন নতুন প্রশ্ন ও বিষয় এলে তার সমাধান করতে শেখা। নতুন কোন চ্যালেঞ্জ এলে তার মুখোমুখি হতে শেখা। এইজন্য কিতাব শেখানোর সাথে সাথে আমাদের নবী (সা.) হিকমাহ শেখাতেন। যা ছিলো তাঁর জীবন আচরণ। সাহাবায়ে কিরাম আমাদের নবীর জীবনে কোন বিষয় না পেলে তা নিজের বুদ্ধি ও শুরায় সিদ্ধান্ত নিতেন। ঐগুলোকেও আমাদের নবী (সা.) মান্য হিসেবে দেখিয়েছেন। কিন্তু উম্মাহর জীবনে ঐসবের কোন ক্ষেত্র যেন আর বাকি থাকলো না।

(ঙ) সভ্যতার দর্শনগুলো সব যেন সেই গ্রীক, হিন্দু, পাশ্চত্যদের কাছ থেকেই নিতে হচ্ছে। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে গেলো ওদের একচেটিয়া রাজত্ব। ঐখানে ইসলামের নাম গন্ধ যেন থাকবে না। পাশ্চাত্য দর্শন, পাশ্চাত্য পদ্ধতি, পশ্চিমা মেথড সবই যেন মুসলিমদের টাকায় ও শ্রমে মুসলিমদের পড়াতে হবে, শিখাতে হবে, তোতার মত বুলি দিতে হবে মুখে। এভাবে প্রতিটি মুসলিম দেশে ইসলামী চিন্তা হলো দুর্বল, ইসলামের দর্শন হলো বলির পাঠা।

আজ অবধি ইসলামী দর্শন বলতে ঐ সেই আগেকার কিছু মিউজিয়ামে থাকা বিষয়, আর এখনই চলার জন্য যে মত ও পথ তা হলো পশ্চিম থেকে আসা। এই ক্ষেত্রে আমাদের কাজ করতে হবে। আমাদের দর্শন চিন্তাকে আধুনিক যুগের জন্য উৎপাদনের উপযোগী বানাতে হবে। সেই জন্যই আসে মুসলিম সেন্টিমেন্ট তৈরি ও সংকল্পের বাধা।

তিন

ডঃ আব্দুল হামিদ আবু সুলাইমানের এইটা আরেকটা শিক্ষা দর্শনের নাম। أَزْمَةُ الإِرَادَة وَالوَجْدَانِ المُسْلِم। মুসলিম সেন্টিমেন্ট ও সংকল্প তৈরি হয় তারবিয়্যাহর মাধ্যমে। ইসলাম তাই শিক্ষাকে মেন্টরিং বা সার্বক্ষণিক পরিচর্যার মাধ্যমে কাউকে বড়ো করে তোলার দর্শনকে প্রমোট করে। তিনি এটাকে একজন সৈনিকের ট্রেইনিং প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন। বলেছেন একজন সেনাকে সাহস ও "অলা" বা দেশের সাথে কমিটমেন্টের উপর গড়ে তুলতে হয়। সরকার প্রধান চেঞ্জ হতে পারে, দেশের প্রতি তার কমিটমেন্ট ঠিক থাকে, সাহসের সাথে। আমাদের নবী (সা.) সেইটাই করেছেন। ছোটদের তিনি মেন্টরিং করতেন। কার ভেতরে কোন প্রতিভা আছে তা খুঁজে খুঁজে সেইভাবে প্রশিক্ষিত করেছেন। তাকে সাহসী বানাতেন। তারা নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর সামনেই ১৭ বছর বয়সে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁর হাতে গড়া উসামা ইবন যায়েদ (রা.)। কিন্তু আজ কি হচ্ছে, বাচ্চাদের "আক্বল" ও বুদ্ধিবৃত্তিকে খাটো করা হয়। আমাদের পরবর্তী জেনারেশানের বুদ্ধিবৃত্তিতে খাদ ও ভ্রান্তি আছে বলা হয়। ফলে তাদের চিন্তা তাদের মাঝেই ঘুরে ফিরে, বাস্তব জগতে তার স্ফুরণ অথবা প্রকাশ হয় না কোথাও।

অন্যদিকে যারা তাদের পরিশীলিত করবে, বড়ো বানাবে তারা হোক না কোন প্রতিষ্ঠান, অথবা পলিসি অথবা রাজনীতি, তারা হয়ে গেছে পৃথিবীর বড়ো বড়ো পরিবর্তনের সামনে গতিহীন ও স্বাভাবিক উন্নয়নের মুখোমুখি দাঁড়ানোয় অক্ষম। ফলে তাদের একমাত্র ভাষা হলো জবরদস্তি, জেল জুলুম বা তরবারি। ফলে একটা বুদ্ধি প্রতিবন্ধি দাস শ্রেণির উত্থান এখন সর্বত্র। যাদের মাঝে দুইটা রোগ মারাত্মক ভাবে সংক্রমিত হয়েছে। এক: ভীরুতা। দুই: ইনিশিয়েটিভ বা পদক্ষেপ গ্রহণে অনীহা। ঠিক যেমনটি হয়েছিলো বনি ইসরাঈলের। মুসা (আ.) যখন তাদের বললেন, আরদুল মুকাদ্দাসায় এগিয়ে যাও, সেটাই তোমাদের প্রমিজ ল্যান্ড বা ওয়াদা দেওয়া দেশ। কিন্তু ওরা আমালিকাদের দেখে ভয় পেয়ে যায় এবং সামনে যাবার গতি হারায়ে ফেলে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে আবার গড়ে তোলার দায়িত্ব দেন মুসা, হারুন, ইউশা ইবন নুন (আলাইহিমুসসালাম) কে। তাদের দেওয়া হয় আলোময়ও জাগরণের তাওরাহ কিতাব এবং ৪০ বছরের ট্রেইনিং সেশন। পরে স্বাধীন ও আল্লাহর উপর আস্থাশীল এক জেনারেশান সেই দেশ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

চার

তিনি এরই আলোকে দুইটি দর্শন নিয়ে কাজ করেন। একটা হলো এমন শিক্ষানীতি ও বিদ্যালয় তৈরি করা যা হবে বর্তমান জগতে পাশ্চত্যের বলয় থেকে বের হওয়ার "বিকল্প"। রিয়াদের আলা মানারাতের মাধ্যমে প্রাইমারি থেকে কলেজ লেভেল পর্যন্ত শিক্ষার ইসলামী করণের কাজে হাত দেন এবং ১৯৮৮ সাল থেকে মালয়েশিয়ায় যেয়ে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়কে সুশোভিত করতে সচেষ্ট হন। তার একটা সাক্ষাৎকারে এই শিক্ষা দর্শনকে ব্যাখ্যা করেন। তিনি শিক্ষা নীতির প্রথম ভাগকে বলে আযমআতুল ইরাদাহ ওয়াল উজদান। যার মূলনীতি হলো শিক্ষক শুধু জ্ঞান দান করে ক্ষান্ত হবেন না, ছাত্রের সাথে গড়ে তুলবেন অন্যরকম সম্পর্ক। তিনি বলেন, পাশ্চাত্য শিক্ষা ব্যবস্থার মূল জায়গায় আসে প্রতিযোগিতা, বা survival for the fittest দর্শনে। সেখানে একজন ছাত্রের সাথে আরেকজনের সম্পর্ক হলো পৃথকীকরণ। সেখানে আরেকটা হলো নিজকে অন্যের উপরে স্থাপনের ভয়ংকর মানসিকতা। ফলে শিক্ষকের কাজ শিক্ষা দিয়েই শেষ।

তিনি মনে করেন ইসলামী তারবিয়্যাহর মূল প্রণোদনা হলো সব মানুষ আদম ও হাওয়ার সন্তান। এখানে প্রত্যেকের আলাদা আলাদা প্রতিভা ও প্রভাব থাকলেও সবাই এক দিকেই অগ্রসর হওয়া একে অপরে সহযোগী বা সতীর্থ। ফলে এদের সম্পর্ক জান্নাত পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। এরই আলোকে তিনি ছাত্রদের মাঝে সম্পর্ক গড়ে তোলার দুইটা পদ্ধতি পরিচিত করান:

(ক) একটার নাম দেন উসরাহ, বা পরিবার। যেখানে একই ক্লাসে পড়া ছাত্রদের মাঝ থেকে যে বেশি তাক্বওয়ার অধিকারী ও লীডারশিপের যোগ্যতা রাখে তার নেতৃত্বে নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্র বা ছাত্রী দিয়ে প্রতি সপ্তাহে নানা ধরণের প্রোগ্রাম করানো। এইগুলো

থাকবে এতো আন্তরিকতায় ঋদ্ধ ও জ্ঞানের বিভায় বিকশিত যে, সবাই এখানে সময় দেওয়া জীবনের একটা ব্রত মনে করবে।

(খ) দ্বিতীয় পদ্ধতির নাম দেন fostering বা পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের সম্পর্ক। এতে করে একজন ছাত্রকে খুব সফল এক পরিবারের কিছুদিনের জন্য পাঠানো হবে, সেখানে গিয়ে সন্তানের মর্যাদা নিয়ে সে থাকবে, তাদের ব্যবহার ও আচার আচরণে অভ্যস্ত হবে এবং জীবনের জন্য রোল মডেলের একটা জায়গা খুঁজে পাবে। আমি দেখেছি এতে করে ছাত্রদের মাঝে অনেক বড়ো হবার সাধ যেমন জাগে, তেমন হীনমন্যতা থেকে মুক্ত হতে পারে।

পাঁচ

তার শিক্ষা দর্শনের আরেকটা দিক হলো "বিকল্প" উদ্ভাবন। আধুনিক জ্ঞান গবেষণা আজ থেকে দুই তিন শত বছর আগে এটাই করে ছিলো। তারা মুসলিমদের জ্ঞান বিজ্ঞান ধার নিয়ে সেখান থেকেই তা ডেভালপ করে সামনে এমন ভাবে নিয়ে যায়, এখনকার কেউ জানেই না যে এই সব জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক কিছু মুসলিম শিক্ষানীতির প্রসবিত সন্তান। তিনি এই বিকল্পকে إِسلامِيَّةُ المَعْرَفَة বা জ্ঞানের ইসলামী করণ হিসেবে চিহ্নিত করে। ভার্জিনয়ার ট্রিপল আইটি হয়ে ওঠে এই প্রকল্পের সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান। আর একে কেন্দ্র করে উঠে দাঁড়ায় পৃথিবীর নানা দেশের অনেক স্কলার। এই দর্শনকে প্রাক্টিক্যাল ফিল্ডে আনতে তিনি যে কাজ করেন, তা হলো:

১) স্কুল, কলেজ, প্রি-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স, বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স সমূহের সিলেবাস কারিকুলামকে ইসলামীকরণ করার পরিকল্পনা গ্রহন করেন। এর জন্য নতুন বই, যার কন্টেন্ট হবে ইসলামাশ্রিত, ব্যাপকভাবে প্রকাশ শুরু হয়। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইসলামীকরণ, বিজ্ঞান প্রযুক্তি, মেডিকেল সাইয়েন্স, অর্থ ও ফাইনান্স, এডমিন ও আইন, সব সব কিছুকে ইসলামের ছাঁচে ঢেলে সাজানো হয়। এর জন্য অর্থ লগ্নি হয় কোটি কোটি টাকা এবং সেমিনার সিম্পোজিয়ামসহ বই প্রকাশ হতে থাকে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর।

২) বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা হয় খুবই প্রাগমটিক পন্থায়।

(ক) এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যারাই পড়বে তাদেরকে কুরআন, আরবি ভাষা, ইংরেজি ভাষা ও ইসলামিক স্টাডিজের ৮টা আবশ্যক কোর্স নিতে হবে। যাকে বলা হবে URC, মানে University requirement course, এতে করে যে কোন ফ্যাকাল্টির ই হোক না কেন তাকে মুসলিম মানস তৈরি করা সম্ভব হয়। অমুসলিম ছাত্রদের কুরআন পাঠ বাধ্য করা হয় না। তবে অন্যগুলো পড়তে হবে।

(খ) কিছু কোর্স হলো FRC বা faculty requirement course, যা কোন নির্দিষ্ট ফ্যাকাল্টির সবাইকে পড়তে হবে। ফলে ঐ ফ্যাকাল্টির মূল বিষয়গুলোতে ঐকমত্য তৈরি হয়। যেমন আমি আরবি ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে পড়েছি। কিন্তু আমার ফ্যকাল্টির নাম ছিলো IRKH বা Islamic Revealed Knowledge and Heritage, এতে আমাকে আরবি ভাষা ও সাহিত্য ছাড়াও অন্য কিছু কোর্স করতে হয়।

(গ) তিনি প্রতিটা বিভাগে স্পেশালাইজেশনের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয় পরিচিত করেন, ফলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে কেও যেন বেকার না থাকে।

(ঘ) কো-কারিক্যুলাম ও এক্সট্রা কারিক্যুলাম সাবজেক্টগুলো এমন ভাবে ইসলাম সমৃদ্ধ ও আধুনিকায়ন করা হয় যে, বিশ্ব সেরা ফোরামগুলোতে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছড়িয়ে পড়ে।

তার এই বিকল্প উদ্ভাবনটা কালের চক্রে এখন কিছুটা হারিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা দেখছি তা যথেষ্ঠ প্রভাব ফেলে ছিলো।

ছয়

কিং সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে তার অবদান ছিলো। আরব বিশ্বের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যলয়ের লাইব্রেরিকে সেরা করে বানিয়েছিলেন। মালয়েশিয়াতেও তিনি লাইব্রেরিকে গড়ে তোলেন সেরা করে। সমস্ত মত ও পথের বই এখানে পাওয়া যেতো। একবার আমার থিসিসের জন্য অনেক টাকার বই লাগতেছিলো। আমার সুপার-ভাইজার তার কাছে আলোচনা করতেই জবাব দিলেন বই এর লিস্ট লাইব্রেরিয়ান প্রফেসর ডঃ মুমতাযকে দিতে বলেন, আমি বলে দিচ্ছি ৩ সপ্তাহের মধ্যে এনে দেবে।

আমরা যারা বড়ো স্কলারশিপ নিয়ে পড়তাম, তাদের স্কলারশিপকে তিনি "শিক্ষা ঋণ" বলতেন। একবার তাকে আমরা একান্তে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, উস্তায এই যে আপনি আমাদের কাছ থেকে সিগনেচার নিয়ে এই দেওয়া স্কলারশিপকে ঋণ বানায়ে দিলেন, আমরা যদি শোধ না করতে পারি, তখন কি হবে? তিনি বললেন, আমি চাই না তোমার মনের দিক দিয়ে ছোট হয়ে গড়ে ওঠো। এই টাকা তোমরা নিচ্ছ পড়া শুনা করে উম্মাতের কন্ট্রিবিউটার হবে। তখন তোমার তোমাদের সাধ্যমত এই টাকা পরিশোধ করবে, আর না পারলে তো স্কলারশিপই। এতে করে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থের অভাব হবে না।

সাত

ডঃ আব্দুল হামিদ অনেক অনেক বই ও গবেষণা আর্টিকেল লিখে গেছেন। বিশেষ ভাবে পরিচিতগুলো হলো:

১) আযমাতুল আক্বল আলমুসলিম (মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তির ক্রাইসিস)

২) দ্বারবুল মারআহ (স্ত্রীকে মারা)

৩) ইশকালিয়্যাতুল ইসতিবদাদ ওয়াল ফাসাদ ফিল ফিকর (চিন্তা ও দর্শনে স্বৈরাচারবৃত্তি ও ক্ষতি)

৪) জাযীরাতুল বান্নাঈন (সৃষ্টিশীলদের দ্বীপ)

৫) আন নাযরিয়াতুল ইসলামীয়্যাহ লিল আলাক্বাত দাওলিয়্যাহ (ইসলামের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক)

৬) আল ইসলাহ আল ইসলামী আলমুআসির (আধুনিক ইসলামী সংস্কার)

আল্লাহ তাআলা এই ক্ষণজন্মা প্রফেসরকে কবুল করুন এবং তার সমস্ত অবদানকে জান্নাতে যাওয়ার উসিলাহ বানায়ে দিন, আমীন।

লেখক : ইসলামী চিন্তাবিদ লেখক ও গবেষক।

ইউরোপে ইসলামের দাওয়াত : কতিপয় চ্যালেঞ্জ ও করণীয়

আব্দুদ্দাইয়ান মুহাম্মদ ইউনুছ

ভূমিকা

প্রথমত: আধুনিক ইউরোপে মোট দেশের সংখ্যা পঞ্চাশটি। পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৭.৪% ইউরোপে বসবাস করছে। মুসলমানেরা ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফেইথ গ্রুপ। ৫৬ মিলিয়ন মুসলমান ইউরোপে বসবাস করছে। জার্মানি ও ফ্রান্সে সব চেয়ে বেশি মুসলমান বাস করে। জার্মানিতে ৪.৮ মিলিয়ন মুসলমান আছে যা উক্ত দেশের জনসংখ্যার ৫.৮% আর ফ্রান্সে মুসলমানদের সংখ্যা ৪.৭ মিলিয়ন যা দেশের জনসংখ্যার ৭.৫%। ৫৬ মিলিয়ন মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে ইউরোপের প্রায় ৭৪০ মিলিয়ন মানুষের কাছে ইসলামের আদর্শ তুলে ধরা।

দ্বিতীয়ত: Islam most misunderstood religion in the world. ইউরোপয়ীন নন মুসলমানের মধ্যে ইসলাম, কুরআন, ইসলামে নারীর অধিকার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত ধারণা আছে তা দূর করার চেষ্টা করা ।

তৃতীয়ত: অনেক মুসলমান দ্বীনের সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখেন না; কেউ কেউ বস্তুবাদী চিন্তা চেতনায় নিমজ্জিত। মুসলমানেরা ভুলে যাচ্ছে তাদের আত্মপরিচয়।

চতুর্থত: ইউরোপে একদিকে অকে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করছে। কিন্তু তারপাশি পাশি অনেকেই ইসলামচ্যুত হচ্ছে। একদিকে মুস-লিমদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুসলানদের মাঝে সমকামী সংস্থাও প্রকাশ্যে কাজ করতে দ্বিধা করছেন। মুসলিম যুবকরা ড্রাগস নানা ধরনের অনৈতিক কর্মকাণ্ড জড়িয়ে পড়ছে। মুসলমানদের মাঝে নানা ধরনের অপরাধ প্রবনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এমতাবস্থায় মুসলমানদের দায়িত্ব হচ্ছে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ করা। আল্লাহ তায়ালা সুরা আল ইমরানের ১০৪ নম্বর আয়াতে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ বাধ্যতামূলক করেছেন। উক্ত আয়াতের আলোকে উলামায়ে কেরামের কারো কারো অভিমত হচ্ছে আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারের কাজ ফরজে কেফায়াহ। একটি সমাজে কেউ কোন ধরনের অন্যায় অপকর্ম দেখলে তা দূর করার চেষ্টা করা আবশ্যক। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় কোথাও কোন অসৎ কাজ হতে না দেখলেও সৎ কাজের আদেশ-উপদেশ দিতে হবে। যেমন রমযান মাস অনেক দূরে। তারপরও আগ থেকে উপদেশ দিতে হবে যে রমযান মাস এলে রোজা রাখা ফরজ। মুফতী শফী তাঁর তাফসীরে উল্লেখ করেন যে, কল্যাণের প্রতি আহ্বানের দুটি পর্যায় রয়েছে। প্রথম পর্যায় অমুসলমানদেরকে খায়র তথা ইসলামের প্রতি আহ্বান করা। অতএব প্রত্যেক মুসলমান এর দায়িত্ব হচ্ছে দুনিয়ার সকল সম্প্রদায়কে ভাষা ও কর্মের মাধ্যমে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা। দ্বিতীয় পর্যায় হল কল্যাণের প্রতি স্বয়ং মুসলমানদেরকে আহ্বান করা। আর এই আহ্বান দুই প্রকার। একটি ব্যাপক আহ্বান অর্থাৎ সব মুসলমানদেরকে শরীয়তের প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান ও ইসলামী চরিত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল করা। দ্বিতীয়টি বিশেষ আহ্বান অর্থাৎ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। আর মারুফ অর্থ হচ্ছে পরিচিত। প্রত্যেক নবী আপন আপন যুগে যেসব সৎ কর্মের প্রচলন করেছেন তার সবই মারুফ কাজের অন্তর্ভুক্ত। আর রসুলুল্লাহ সতকর্মরুপী যেসব কাজকে অবৈধ

করেছেন তার সবই মুনকার। এই আয়াত থেকে বুঝা যায় নিজের কাজ কর্ম আল্লাহর নির্দেশমত ও রসুলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নাহ অনুযায়ী করা যেমনিভাবে আবশ্যক। অনুরূপভাবে অপর ভাইদের কাজ কর্ম সংশোধনের চেষ্টা করাও দায়িত্ব।

আল্লাহ তার বান্দাহদেরকে আল্লাহ সত্যদ্বীনের যতটুকু জ্ঞান দান করেছেন তা অপরের কাছে পৌছানো তার উপর আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে সুরা বাকারার ১৫৯-১৬০ নম্বর আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে যে আল্লাহ প্রদত্ত সত্য দ্বীনের জ্ঞান গোপন করা মস্ত বড়ো অপরাধ। সুরা আল আসর অধ্যয়ন করলে স্পষ্ট যে, যারা পরস্পরকে হকের ও সবরের উপদেশ দেয় না তারা ক্ষতিগ্রস্ত। উপরিউক্ত আয়াত সমূহের আলোকে আল্লামা জামআ আমিন আব্দুল আজিজ বলেন, কোন সমাজে পাপাচার ব্যাপকতা লাভ করলে এবং দায়ীর সংখ্যা কমে গেলে দাওয়াত ইলাল্লাহ ফরজে আইন হয়ে পড়ে।

ইউরোপে ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রম উদ্দেশ্য সমূহ

১.অমুসলিমদের সামনে ইসলামের সঠিক পরিচয় তুলে ধরা এবং ভুল ধারণা দূর করা। পাশ্চাত্যে অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। বিশেষত War on Terrorr এর নামে war on Islam শুরু হবার পর থেকে নানাভাবে ইসলামকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। ইসলাম ও জিহাদ, ইসলামে নারী অধিকার, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম সম্পর্কে নানা ধরনের প্রশ্ন রয়েছে। এসব প্রশ্নের বুদ্ধি বৃত্তিক জবাব দেওয়া জরুরি। ইসলামের উপর যেসব অভিযোগ পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীরা উপস্থাপন করেন তার জবাব দেওয়া সকল মুসলমানের উপর ফরজ অল-কিফায়াহ। আর এক্ষেত্রে ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে মন্দের জবাব ভাল পন্থায় দেওয়া। তাই আমাদেরকে ইসলামী কৃষ্টি ও কালচার তুলে ধরতে হবে। কেননা অনেকেই ইসলামী কৃষ্টি ও কালচার না জানার কারণেই বিভ্রান্তিতে রয়েছে। যেমন ইসলাম মুসলিম নারীদেরকে কি মর্যাদা দিয়েছে তা অনেকেই জানে না।

২.ইউরোপের মুসলমানদের সামনে ইসলামের আহ্বান পৌছে দেওয়া ও ইসলামের অনুশাসন মেনে চলার দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করা। ব্যক্তিগত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একজন মুসলিম আরেকজন মুসলিমকে নাসীহা করা ঈমানদারদের বৈশিষ্ট্য। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার হলো দাওয়াতি কাজের সর্বোত্তম পন্থা। যিনি যেখানে অবস্থান করেন বা কাজ করেন সে এলাকার মধ্য থেকে কয়েকজনকে বেছে নিয়ে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে দাওয়াতি কাজ করতে হবে[৪]।

৩. মাইনরিটি হিসাবে ইউরোপে বসবাসকারী মুসলমানদের বিভিন্ন ইস্যু ও সমস্যার দিকনির্দেশনা প্রদান করা ইসলামী দাওয়াহ সংগঠনের অন্যতম উদ্দেশ্য। শুধু মুসলমানদের নয় সাধারণত যে কোন ন্যায় সংগত সমস্যা সমাধানে ভূমিকা পালন করা। মানবাধিকার রক্ষা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালন করা। মুসলমানদেরকে সামাজিক দায়িত্ব পালনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা। যেসব মুসলমান ইউরোপে বসবাস করছেন তাঁরা ইউরোপের বিভিন্ন দেশের নাগরিক সুবিধাদি ভোগ করছেন। যারা নাগরিক সুবিধাদি ভোগ করছেন তাদেরকে নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা দরকার। মুসলিম যুব সমাজকে নৈতিক অধঃপতন থেকে রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করা। ইসলামী বিভিন্ন সংগঠনের মাঝে সহযোগিতা মূলক সম্পর্ক স্থাপন করা ইসলামী দাওয়াহ সংগঠনগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য।

ইউরোপে দাওয়াতি কাজে কতিপয় সমস্যা

১) ইউরোপ হচ্ছে খ্রিষ্টান, ইহুদিসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বাস। সকল ধর্মাবলম্বীদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করার মত যেই ধরনের ভাষা জ্ঞান ও ইসলামী আদর্শ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা দরকার তা অনেকের মুসলমানেরই নেই।

২) আধুনিক উপায় উপকরণ ব্যবহারের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় উপাদানের অভাব। ইউরোপীয় বিভিন্ন ভাষায় ইসলাম সংক্রান্ত মৌলিক বই পুস্তকসহ অন্যান্য উপায় উপকরণের স্বল্পতা রয়েছে। তাই ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় সাহিত্য রচনা, অনুবাদ, অডিও-ভিডিও প্রকাশ ও বন্টনের ব্যবস্থা নিতে হবে।

৩) যোগ্য ইসলামী স্কলারের অভাব: ইউরোপে যোগ্য ইসলামী স্কলারের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে আসা আলেম সমাজের কেউ কেউ ইসলামের গভীর জ্ঞান রাখলেও ইউরোপের সমাজ ও সভ্যতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা নেই। তাই উলামায়ে কেরামকে ইসলামের গভীর জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং তাঁরা যেন ইউরোপের প্রেক্ষাপটে নানা ধরনের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন সে যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

৪) মিডিয়াতে অপপ্রচার: মুসলমানদেরকে টেরোরিস্ট হিসাবে আখ্যায়িত করে মিডিয়াতে অব্যাহত প্রচারণা চলছে। মিডিয়াতে ইসলাম সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন বারবার উপস্থাপন করা হয় সে সম্পর্কে ভারসাম্যমূলক বক্তব্য আরও বেশি আসা দরকার।

৫) পর্যাপ্ত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব: ইউরোপে মুসলিম ছেলে সন্তানদেরকে ইসলামী আদর্শের আলোকে গড়ে তোলার জন্য ভালমানের পর্যাপ্ত ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই।

৬) ইসলামী দাওয়াহ সংগঠনগুলোর মাঝে কার্যকর সমন্বয় নেই। বৃটেনের কিছু ইসলামী সংগঠন নিয়ে একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি থাকলেও তা মাঝে মধ্যে মিটিং সর্বস্ব হয়ে পড়েছে। মূলত ইসলামী দাওয়াহ সংগঠনগুলো ইউরোপে কিছু সমন্বিত কর্মসূচি নিতে পারে।

৭) কালচারাল সমস্যা: মুসলমানদের জন্য কালচারাল আইডেন্টেটি ইউরোপের বড়ো ধরনের একটি সমস্যা। মুসলমানেরা কি ইউরোপে

বিচ্ছিন্ন থাকবে না কি একীভূত হবে না ইন্ট্রেগ্রেট করবে তা বড়ো ধরনের প্রশ্ন।

৮) ইউরোপে দাওয়াহ সংগঠনগুলোর অগ্রাধিকার কি হবে তা নির্ধারনে ঐক্যমত হওয়া এক ধরনের চ্যালেঞ্জ। এই ক্ষেত্রে কারো কথা হচ্ছে ইক্বামাতে দ্বীন ও খিলাফত প্রতিষ্ঠা। আর কারো মতে মুসলমানদের তাযকিয়্যাহ হচ্ছে অগ্রাধিকার।

ইউরোপের মুসলমানদের কতিপয় দায়িত্ব

১.ইউরোপে মুসলমানদের ইতিহাস জানা: ইউরোপের সাথে মুসলিম দুনিয়ার সম্পর্ক সেই খলিফাতুল মুসলিমিনদের সময় থেকেই এবং কয়েক পর্যায়ে ইসলামের বিস্তার হয়েছে ।

প্রথমত: আল্লাহর রসুল সালালাহু আলাইহি ওয়াসালামের বিদায় হজের পর তাঁর সঙ্গী-সাথিদের অনেকেই ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছুটে যান। তারই ধারাবাহিকতায় ইউরোপে কতিপয় সাহাবার আগমন ঘটে। সাইপ্রাসে মহিলা সাহাবী উম্মে হারাম বিনতে মিলহান ও তুরস্কে হযরত আবু আইউব আনসারীসহ আরও কতিপয় সাহাবা ও মহিলা সাহাবীর কবর রয়েছে।

দ্বিতীয়ত: মুসলমানদের দাওয়াত ও চরিত্র মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী অনেকেই ইসলাম কবুল করেন। এছাড়া কেউ কেউ ইসলাম অধ্যয়ন করে কিংবা মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপপ্রচারের জবাব খুঁজতে গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ ইবন মুসা আল-খারেযেমী ৮১৭ খৃস্টাব্দে তাঁর সুরাত আল-আরদ গ্রন্থে বৃটেনে কিভাবে ইসলামের আগমন হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন, The powerful Anglo-Saxon King, Offa of Mercia (died 796), had coins minted with the inscription of the declation of Islamic faith in Arabic, serving as evidence, at the very least, of tradevrelation with the Muslim World... "মার্সিয়ার শক্তিশালী এ্যাংলো স্যাকসন রাজা কিং ওফা (মৃত-৭৯৬ খ্রিষ্টাব্দ) আরবিতে কালেমা খোদাই করা মুদ্রা চালু করেছিলেন। এটি প্রমাণ করে অন্তত ইংল্যান্ডের সাথে তখন থেকেই মুসলিম বিশ্বের সাথে ব্যবসা চালু ছিলো।

তৃতীয়ত: তারেক ইবন যিয়াদের নেতৃত্বে (৭১১-৭১২ খৃ) মুসলমানদের স্পেন বিজয়ের পর অনেক মুসলমান ইউরোপে আসেন এবং ইউরোপের কিছু অংশ দীর্ঘদিন শাসন করে। সে সময় সিসিলীসহ ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে মুসলমানেরা ছড়িয়ে পড়ে। ৭১১ সনে তারিক ইবন যিয়াদ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে জিব্রাল্টার আসেন। এত ক্ষুদ্র বাহিনীর দেখে স্পেনরাজ রডারিক চিন্তাই করেনি যে মুসলমানেরা তার বিরাট বাহিনীর মোকাবিলা করতে পারবে। অকুতোভয় তারিক ইবন যিয়াদ জিব্রাল্টারে পৌঁছার পর প্রথমেই সকল জাহাজ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেন। তারপর সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বলেন, চেয়ে দেখ বন্ধুগণ গভীর সমুদ্র আমাদের পিছনে গর্জন করছে। আর সামনে অন্যায়-অত্যাচারের প্রতীক রডারিক বাহিনী। আমরা যদি পালিয়ে যেতে চাই সমুদ্র আমাদেরকে গ্রাস করবে। আর যদি সামনে অগ্রসর হই তাহলে ন্যায় ও বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আমরা শহীদ হবো কিংবা বিজয় মাল্য লাভ করে আমরা গাজী হব। এই জীবন মরণ সংগ্রামে কে আমার অনুগামী হবে? সকল সৈন্যই আল্লাহু আকবার ধ্বনি দিয়ে তাঁর অনুগামী হওয়ার ঘোষণা দেয়। এরপর স্পেনরাজ রডারিকের প্রধান সেনাপতি থিওডমিরেরর নেতৃত্বাধীন বিশাল বাহিনীর সাথে মুসলমানদের অসম যুদ্ধ হয়। কিন্তু এই অসম যুদ্ধেই রডারিক বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং মুসলমানদের বিজয় হয়। তারিক ইবন যিয়াদ এর নেতৃত্বে স্পেন বিজয় (৭১১-৭১২ খৃ) করার পর থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে মুসলমানদের আগমন ঘটে।

চতুর্থত: তুরস্কের উসমানীয় খিলাফতকালে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইসলামের বিস্তার ঘটে। বসনিয়াসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশে মুসলিম শাসন কিংবা মুসলমানদের প্রভাব প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

পঞ্চমত: অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশ ও ফ্রান্সের কলোনী রাজ্যসমূহ থেকে শ্রমিক হিসাবে এবং বিভিন্ন পেশায় চাকুরীজীবী হিসাবে কিছু মুসলমান ইউরোপে আসেন। স্পেনে মুসলিম সালতানাত ও তুরস্কের উসমানী খিলাফতের পতনের পর ইউরোপে মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস পায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বৃটিশ ও ফ্রান্সের কলোনী রাজ্যসমূহ থেকে শ্রমিক ও চাকুরীজীবী হিসাবে ইউরোপে অনেক মুসলমান আগমন করেন। বিশেষত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে অনেক মুসলমান ইউরোপে আসেন। ১৮৫০ সালে লন্ডনের বিভিন্ন বন্দরে বাঙালী ও ইয়েমেনী জাহাজী কর্মীদের আগমন হয় বলে জানা যায়। তাদেরকে লস্কর নামে আখ্যায়িত করা হতো। ১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (সিপাহী বিদ্রোহ) শুরু হওয়ার এক মাস আগে খৃষ্টান মিশন পূর্ব লন্ডনে এসব লস্করদের জন্য "স্ট্রেনজারস হোম ফর এশিয়াটিকস" প্রতিষ্ঠা করে।

ষষ্ঠত: বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী, ছাত্র বা ব্যবসায়ী কিংবা Spouse ভিসায় অনেক মুসলমান ইউরোপে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। বর্তমানে ইউরোপের মুসলমানদের এক বিরাট অংশ অভিবাসীদের ঘরে জন্ম গ্রহণকারী তরুণ প্রজন্ম। বর্তমানে ইউরোপে মুসলমানদের বড়ো অংশ হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত মাইগ্রেটেড। তাঁরা বিভিন্ন সময় নানা ভাবে ইউরোপে আসেন। কেউ কেউ চাকুরি করার উদ্দেশ্যে আর কেউ পড়াশুনার উদ্দেশ্যে ইউরোপে আসেন। আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে কিংবা ব্যবসায়ী অথবা ইউরোপীয় কোন নাগরিকের সাথে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে Spouse Visa নিয়ে ইউরোপে আসেন।

২.ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানার্জন করা: ইসলাম সম্পর্কে মৌলিক জ্ঞানার্জন করতে হবে । কুরআন , হাদীস, ফিকহ, সীরাত, আকাঈদসহ বিভিন্ন বিষয়ে লেখা ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন

করে ইসলামের Comprehensive understanding অর্জন করতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকার কারণে ইসলাম সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য একপেশে হয়ে পড়ে। অথচ ইসলাম হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। তাই আমাদেরকে ইসলামের ব্যালেন্সড আন্ডারস্টান্ডিং ডেভেলপ করতে হবে। কোন বিষয় জানা না থাকলে গোঁজামিলের আশ্রয় নিবো না বরং পরবর্তীতে সঠিক তথ্য জেনেই প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব দিবেন।

৩.ইউরোপে নানা ধরনের প্রশ্নের জবাব দানের যোগ্যতা অর্জন করা: ইউরোপে আমরা ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হই। তাই আমাদেরকে নানামুখী প্রশ্নের যৌক্তিক জবাব জানতে হবে। বর্তমানে ইসলামে নারীর অধিকার বিষয়ে অনেক অপপ্রচার চালানো হয়। অথচ ইসলামই প্রথম নারীকে মর্যাদা দেয়। ১৮৫০ সালের আগ পর্যন্ত ইংল্যান্ডে সম্পত্তিতে নারীদের কোন অধিকার ছিল না। কোন নারী উত্তরাধিকার সূত্রে কোন সম্পদ পেলে তা স্বামীর সম্পদে পরিণত হতো। ১৯২১ সাল পর্যন্ত নারীর কোন ভোটাধিকার ছিল না। ১৯৩০ সালে যুক্তরাজ্যে নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয় এবং ১৯৬৫ সালের আগে ইউরোপে নারীদের সার্বজনীন ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি। রসুলে কারিম (সা.) বিদায় হজের ভাষনে স্পষ্ট করেই বলেছেন, "মেয়েদের ব্যাপারে আল্লাহ পাককে ভয় কর। কেননা তাদেরকে আল্লাহ পাকের আমানতের সাথে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহ পাকের কালামের মাধ্যমে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের অধিকার রয়েছে যে তারা তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে আসতে দেবে না যাদের তোমরা পছন্দ কর না। যদি তারা এরূপ করে তবে তোমরা তাদের প্রহার করতে পারো। কিন্তু বেশি কঠোরভাবে প্রহার করো না। তোমাদের উপর তাদের অধিকার হচ্ছে এই যে, তোমরা তাদের ভালোভাবে পানাহার করাবে এবং পোশাক দেবে। "

৪.ইউরোপ Multi faith society হিসাবে অন্যান্য ফেইথ গ্রুপ এবং তাদের values জানা: এই ক্ষেত্রে ইসলামের সাথে অন্যান্য ফেইথের সামঞ্জস্য ও পার্থক্য কোথায় তা জানতে হবে। যেমন আমরা আল্লাহ প্রেরিত সকল নবী ও রসুলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করি। সকল নবী-রসুল যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এ বিষয়ে কোন পার্থক্য করি না। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ ইরশাদ করেন,

"রসুল ঐ হিদায়াতের উপর ঈমান এনেছেন, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর উপর নাযিল হয়েছে এবং যারা এ রসুলকে মানে তারাও ঐ হিদায়াতকে দিল থেকে মেনে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসুলগণকে মানে। আর তারা বলে, আমরা আল্লাহর রসুলগণের একজন থেকে আর একজনকে আলাদা করি না, আমরা হুকুম শুনেছি ও আনুগত্য কবুল করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে গুনাহ মাফ চাই এবং আপনারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে।" (বাকারা: ২৮৫)। একজন মুসলিমকে সত্যিকার ঈমানদার হওয়ার শর্তই হচ্ছে হযরত ঈসা, হযরত মুসা হযরত ইবরাহীমসহ সকল নবী-রসুলদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা।

৫.ইউরোপের কৃষ্টি, কালচার, ভাষা, সংস্কৃতি এবং আর্থ-সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা: আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক যুগের রসুলকে স্বীয় কাওমের ভাষা-ভাষী করে পাঠিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমি বাণী পাঠাবার জন্য যখনি কোন রসুলকে পাঠিয়েছি, তিনি তার কাওমের ভাষায়ই বাণী পৌঁছিয়েছেন, যাতে তিনি তাদেরকে স্পষ্ট করে কথা বুঝাতে পারেন। আর আল্লাহ যাকে চান গোমরাহ করে দেন এবং যাকে চান হেদায়াত দান করেন। তিনি শক্তিমান ও মহাকুশলী।" (সুরা ইবরাহীম ৪)।

প্রথমেই আমাদেরকে জানতে হবে কোন কোন বিষয় আমাদের জানা দরকার। অনেক সময় আমরা জানি না আমাদের কি জানতে হবে। তাই অপ্রয়োজনীয় বিষয় জানতে গিয়ে অনেক মূল্যবান সময় অপচয় করি।

আমরা যারা ইউরোপে বসবাস করছি এবং ইসলামী দাওয়াহ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে আমরা ইসলাম ও ইউরোপ সম্পর্কে কতটুকু জানি। যারা জন্মগতভাবে ইউরোপীয়ান ও মুসলমান তাদের কাছে ইউরোপের সমাজ, কৃষ্টি ও কালচার পরিষ্কার। কিন্তু যারা মাইগ্রেটেড মুসলমান তাদের কাছে ইউরোপের ভাষা, কৃষ্টি ও কালচার প্রথম পর্যায়ে অনেকাংশে অপরিচিত থাকে। তাই ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই সম্পর্কে জানতে হবে । রসুলে কারিম (সা) তাঁর কিছু সাহাবাকে সুরিয়ানী ভাষাসহ আজমী বিভিন্ন ভাষা শেখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁরা উক্ত ভাষায় ইসলামের বার্তা অনুবাদ করতেন এবং দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনা করতেন। তাই আমরা যারা ইউরোপে মাইগ্রেটেড হিসাবে এসেছি আমাদেরকে ইউরোপের সংশ্লিষ্ট দেশের ভাষা ভালভাবে জানার চেষ্টা করতে হবে। আমার মনে হয় শুধু ভাষা জানাটাই যথেষ্ট নয় আমাদেরকে ইউরোপের কৃষ্টি ও কালচার জানতে হবে। আমাদেরকে জেনে নিতে হবে ইউরোপের কোন কৃষ্টি ও কালচার আমাদের কাছে নতুন হলেও তার সাথে ইসলামের কোন সংঘাত নেই। আর কোন ধরনের কৃষ্টি ও কালচারের সাথে ইসলামী কৃষ্টি ও কালচারের পার্থক্য রয়েছে।

৬. ইউরোপের একজন নাগরিক হিসাবে নাগরিক দায়িত্ব সম্পর্কে জানা: নাগরিক হিসাবে যেসব কমন আইন সকলের জানা থাকা দরকার তা জানতে হবে এবং আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে। নাগরিক অধিকার ও সুবিধা সমূহ কি কি তাও জানতে হবে। আর কোনভাবে কারো নাগরিক অধিকার খর্ব হলে তা প্রতিকারের জন্য কি করা দরকার তাও জানতে হবে। অন্যথায় আমরা নিজেদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে পারি। তাই বৈধ অধিকার সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা জরুরি।

৭. ইউরোপের মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে জানা: বর্তমানে ইউরোপ-আমেরিকা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক শীর্ষে; তথ্য প্রযুক্তিতে অনেক উন্নত। আধুনিক কম্পিউটার, মোবাইল, টেলিফোন, উড়োজাহাজ প্রভৃতি তাদেরই অবদান। কিন্তু খ্রিষ্ট-

ীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুসলমানেরা শীর্ষে ছিল। জাবির ইবন হাইয়ান, ওমর খৈয়াম, ইবন সিনা, আল খাওয়ারেযেমী প্রমুখ বিজ্ঞানীর অবদানের উপর ভিত্তি করেই ইউরোপের জ্ঞান ও সভ্যতার ভিত্তি রচিত হয়েছে। মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী ইবন সিনা, জাবির হাসান বিন হাইয়ান, রাযী , খাওয়ারেযেমী প্রমুখের বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যবই হিসাবে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুসলমানদের অতীত গৌরবময় ইতিহাস অনেক মুসলমানও জানে না। অতীতে ইউরোপ মুসলমানদের কাছ থেকে জ্ঞান ও সভ্যতার আলো নিয়েছিল। ইউরোপ যে মুসলমানদের কাছে ঋণী এই সত্য HHR Prince Charles ১৯৯৩ সালের ২৭ অক্টোবর Oxford এর Scheldonian Theatre এ অনুষ্ঠিত Islam and the West শীর্ষক সেমিনারে এইভাবে প্রকাশ করেন, If there is much misunderstanding in the West about the nature of Islam, there is also much ignorance about the debt our own culture and civilization owe to the Islamic world. It is a failure, which stems, I think from the straight jacket of history, which we have inherited. The medieval Islamic world, from central Asia to the shores of the Atlantic, was a world where scholars and men of learning flourished. But because we have tended to see Islam as the enemy of the west, as an alien culture, society, and system of belief, we have tended to ignore or erase its great relevance to our own history.

"পশ্চিমে ইসলামের প্রকৃতি সম্পর্কেই যে ভুল ধারণা আছে কেবল তা নয়, বরং আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিনির্মাণে ইসলাম কি কার্যকর ভূমিকা রেখেছে সে সম্পর্কেও আমরা বেখবর। আমি মনে করি এটি আমাদের আমাদের একটি বড়ো ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতা আমরা ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি। মধ্য এশিয়া থেকে শুরু করে আটলান্টিকের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত মধ্য যুগের ইসলামী দুনিয়ায় পণ্ডিত আর বিজ্ঞজনেরা বিকশিত হয়েছিলেন। কিন্তু আমরা ইসলামকে পশ্চিমের শত্রু হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, এটিকে একটি অচেনা সমাজ, সংস্কৃতি, ব্যবস্থা ও ধর্মীয় বিশ্বাস বলে মনে করি, সে কারণে আমরা এর মহান অবদানগুলোকে হয় অবজ্ঞা করে আসছি অথবা ইতহাস থেকে ইসলামের অবদানগুলোকে মুছে ফেলেছি।"

ইউরোপ আজকে অনেক উন্নত কিন্তু এক সময় ইউরোপে রাস্তাঘাট উন্নত ছিল না। মানুষ ছিল অজ্ঞ। তাই তারা রাস্তাঘাটে ময়লা আবর্জনা ফেলত। মলমুত্র ত্যাগ করতো। রাস্তাঘাটে বড়ো বড়ো গর্ত ছিল। ইদুর এর উপদ্রব ছিল খুব বেশি। তাই তারা হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালা নামক এক রক্ষাকর্তাকে গল্পের মাধ্যমে আবিষ্কার করেন যিনি বাঁশি বাজিয়ে ইদুর নিধন করেন। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মুসলমানেরা পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ হিসাবে ইউরোপকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার ক্ষেত্রে অবদান রাখে। ইউরোপে পরিচ্ছন্ন পানির অভাবে অনেক শিশু এক বছরের মধ্যেই মারা যেতো। কেননা সকল বাড়িতে পানির ব্যবস্থা ছিল না। টিউবওয়েল এর মাধ্যমে পরিষ্কার পানির ব্যবস্থা ইউরোপে মুসলমানেরাই করে।

ইউরোপ অপরাধপ্রবণ ছিল। আইনের শাসন ছিল না। শাসকরা নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকতো। রাস্তাঘাটে ধর্ষণ খুন-খারাবী লেগে থাকতো। যেহেতু আইনের শাসন ছিল না তাই মানুষ অপরাধীকে ধরতে পারলে মেরে ফেলতো। সামান্য কারণে ইউরোপে যুদ্ধ লেগে যেতো। যেমন ১২২৫ সালে ইটালিতে কাঠের তৈরি একটি বালতি চুরি হওয়ার ঘটনা কেন্দ্র করে বলোনিয়ায় যুদ্ধ হয়। ১২ বছর উক্ত যুদ্ধ স্থায়ী ছিল। এতে হাজার হাজার মানুষ নিহত হয়। কিন্তু বালতি পাওয়া যায়নি। যেমনিভাবে ইসলাম পূর্বযুগে ছাগলে গাছের পাতা খাওয়া কেন্দ্র করে চল্লিশ বছর যুদ্ধ লেগে ছিল।

ইউরোপের মানুষ শাসক গোষ্ঠী দ্বারা নির্যাতিত ছিল। নির্যাতিত মানবতার আহ্বানে সাড়া দিয়েই তারিক ইবন যিয়াদের নেতৃত্বে মুসলমানেরা স্পেন জয়লাভ করে তদানীন্তন রাজা রডারিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। স্পেনে মুসলিম শাসনামলে মুসলমানেরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠ খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ফেইথ গ্রুপের সাথে সম্প্রীতি স্থাপন করে মুসলমানরা সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় অবদান রাখার কারণেই প্রায় ৮শত শতাব্দীকাল সকলেই মুসলিম শাসন মেনে নেয়। সে সময় স্পেনে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় মুসলমানরাই স্থাপন করেন। এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইউরোপের সকল অঞ্চল থেকেই উচ্চ শিক্ষার জন্য মানুষ ভীড় জমাতো। গরিব ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কর্ডোভাতে মুসলমানেরাই প্রথম ফ্রি স্কুল চালু করেন। ইউরোপের প্রথম মেডিক্যাল স্কুল স্পেনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া স্পেন ও সিসিলিতে ইসলামিক ইন্সটিটিউট স্থাপন করে ইউরোপে শিক্ষার উন্নয়নে মুসলমানেরা অবদান রাখেন। ইউসুফ ইবন উমর ৭৯৪ সালে প্রথম কাগজের কারখানা আবিষ্কার করেন। উমাইয়া খলিফা ওয়ালীদ ৭০৬ খ্রি. প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করেন। গ্রানাডা শহরে ১৩৬৬ খ্রি. আন্দালুস হাসপাতাল স্থাপিত হয়। মুসলমানেরাই সর্বপ্রথম হাসপাতালে নারী-পুরুষের জন্য পৃথক ওয়ার্ড ও নার্স নিয়োগ করেন এবং উন্নত সেবা নিশ্চিত করার জন্য রোগীদের রেকর্ড সংরক্ষণ করার সিস্টেম চালু করে।

শুধু শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের অবদান সীমিত ছিল না। রাস্তাঘাট, হাউজিং ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলমানেরা প্রভূত উন্নয়ন করে। মুসলমানেরা স্পেনে উন্নয়নের যে নজির স্থাপন করে তার ঢেউ চৌদ্দশত খ্রিষ্টাব্দে প্যারিস এবং ১৬শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে লাগে। এই প্রসঙ্গে Muslim Heritage in Our World গ্রন্থের ভূমিকায় Professor Salim T S Al-Hassani wj‡Lb, Great Muslim men and women of the past- mathmeticians, astronomers, chemist, physicians, architects, engineers, economist, sociologists, artists, artisians, and educators- expressed their religiosity through benificial contributions to society and humanity.

They did so with open mindness and, in many instances, positively and constructively worked alongside non-Muslims. This track record of cooperation over the centuries, although deeply rooted within early Muslim society, seems to have been fotgotten[ii]. "অতীতের জ্ঞানী মুসলিম ব্যক্তিত্বরা যার মধ্যে আছেন গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ, রসায়নবিদ, চিকিৎসা বিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, স্থাপত্যবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ বিজ্ঞানী, শিল্পী এবং শিক্ষাবিদ তারা সমাজ ও মানবতার প্রতি দায়িত্বপালনের মাধ্যমে তাদের ধর্মীয় চেতনার স্বাক্ষর রেখেছেন। তারা মুক্ত মনের অধিকারী ছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাথে ইতিবাচক এবং সহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করেছেন। প্রথম দিককার মুসলিম সমাজের নিহিত সহযোগিতার এই প্রমাণিত রেকর্ড আজ হারিয়ে গেছে।'

ইউরোপে শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত উৎকৃষ্টতা সাধনে অতীতে মুসলমানেরা অনেক অবদান রাখেন। বর্তমানেও মুসলমানদের অনেকেই ইউরোপে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখছেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য আগত মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি অংশ ইউরোপের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যলয়ে অধ্যাপনার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইউরোপের শিক্ষা, গবেষণা ও শিক্ষা বিস্তারে অবদান রাখছেন এবং ভবিষ্যতেও অবদান রাখবেন।

৮.ইউরোপে মুসলমানেরা কি ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তা জানা: মুসলমানদের জন্য ইউরোপে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ রয়েছে এবং ভবিষ্যত কি ধরনের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে এবং এর আলোকে কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে হবে। ইউরোপে মুসলমানেরা বর্তমানে নানামুখী চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন। Islamopobia & Anti Muslim Hate crime বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রসঙ্গে Robert Lambert and Jonathan Gilhens-Mazer কর্তৃক প্রকাশিত Islamophobia and Anti Muslim Hate Crime- UK Case Studies ২০১০ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মূলত ইউরোপের সাধারণ মানুষদের মাঝে ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু মিডিয়া ইসলাম ভীতি (Islamopobia) ছড়াচ্ছে। বিশেষত ৯/১১ আমেরিকার টুইন টাওয়ার এ হামলা, স্পেনের মাদ্রিদে বোমা বিস্ফোরণ ও লন্ডনে ৭/৭ বোমা হামলাসহ ফ্রান্সের সাম্প্রতিক নিন্দনীয় হামলার পর ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারণা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরিউক্ত ঘটনাসমূহের পর ইসলাম ও সন্ত্রাসবাদকে এক সাথ করে দেখানোর চেষ্টা করছেন অনেক ব্যক্তি, সংগঠন ও মিডিয়া। এরফলে মুসলমানদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পোষন করছেন কেউ কেউ। অনেক দেশে "টেরোরিজম এ্যাক্ট" পাশ হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে বর্ণবাদী হামলা ও Anti Muslim Hate crime বেড়ে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে কিছু মুসলমান নির্মমভাবে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন । রাস্তাঘাটে অপমান ও হুমকি আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। এই বিষয়ে সকলই একমত যে, টুইন টাওয়ার, লন্ডন, মাদ্রিদসহ পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে বোমা হামলা করে নিরপরাধ মানুষ যারা হত্যা করেছে তারা জঘন্যতম অপরাধ করেছে। উক্ত অপরাধের সাথে যারাই সম্পৃক্ত তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া দরকার। কিন্তু কোন একটি ঘটনার জন্য কোন একটি কমিউনিটিকে ঢালাওভাবে দায়ী করা ঠিক নয়। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে উক্ত ঘটনা সমূহের পর মুসলমানদের প্রতি নেতিবাচক চাহনী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কাউন্টার টেরোরিজম এর নামে অনেক নিরাপরাধ মুসলমানকে হয়রানী করা হচ্ছে।

ইউরোপে বর্ণ বৈষম্য ও বর্ণবাদী আচরণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি অনেকই সহজভাবে মেনে নিতে পারছেন না। ইউরোপের কিছু দেশে কিছু পার্টি রয়েছে তারা মুসলমানদের অস্তিত্ব সহ্য করতে পারে না। এর মধ্যে বৃটিশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বি.এন.পি), বেলজিয়াম ফ্লেমিস বক, ডেনমার্কের পিপলস পার্টি, ফ্রান্সের ন্যাশনাল ফ্রন্ট, ইতালির নর্দান লীগ এবং সুইজারল্যান্ডের পিপলস পার্টি উলেখযোগ্য। তাদের প্রচারণায় ইউরোপের কিছু কিছু দেশে কিছু মানুষ চরমভাবে মুসলিম বিদ্বেষী হয়ে উঠেছে।

মূলত ইউরোপের সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার মাধ্যমে বর্তমানে মুসলমানেরা একটি শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার কারণে একটি মহল ইসলামের এই অগ্রযাত্রা সহ্য করতে পারছে না। দ্বিতীয়ত: ইসলামের সত্যিকার মেসেজ ইউরোপের জনগণের বিরাট একটি অংশের কাছে কাছে সুস্পষ্ট নয়। কেউ কেউ ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মাঝে সব সময় দূরত্বের দেয়াল দাঁড় করিয়ে রাখেন। তৃতীয়ত: মুসলমানদের কেউ কেউ ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা অনুসরণ না করার কারণে তাদের ব্যক্তিগত আচরণ ও ব্যবহার নানা ধরনের প্রশ্নের উদ্রেক করে। মুসলমানদের কেউ কেউ ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনের পরিবর্তে একপেশে ও উগ্র মনোভাব পোষন করেন। যার ফলে পাশ্চাত্যের কারো কারো মাঝে মুসলমানদের সম্পর্কে নেতিবাচক একটি মনোভাব সৃষ্টি হয়। আর উক্ত মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদের আচার-আচরণ ও বক্তব্যে।

৯.ইউরোপের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে ধারণা থাকা: আমাদেরকে ইউরোপের শক্তি (Strength) ও দুর্বলতা (weaknesses) জানতে হবে। ইউরোপের শুধু নেতিবাচক দিক নয় ইতিবাচক দিক কি রয়েছে এবং দাওয়াত ইলাল্লাহর ক্ষেত্রে তা কাজে লাগাতে হবে: ইউরোপে স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক কাঠামো বিদ্যমান। ইউরোপের মুসলমানরা স্থিতিশীল গণতান্ত্রিক পরিবেশে (The stable democracy) বসবাস করছে। ইউরোপের সকল দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অত্যন্ত স্থিতিশীল। অথচ মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশে গণতন্ত্রের পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার কিংবা গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে স্বৈরাচারী সরকার রয়েছে। ইউরোপের নাগরিকদের জন্য অনেক সামাজিক বেনিফিট রয়েছে। আমাদের দায়িত্ব শুধু বেনিফিট গ্রহণ করা নয় বরং সমাজের কল্যাণে দায়ী হিসাবে ভূমিকা রাখা।

ইউরোপে সামাজিক মূল্যবোধ এর সাথে ইসলামের কতটুকু সঙ্গতি বা অসঙ্গতি রয়েছে তা জানা দরকার : যেমন ইউরোপের Ethics

and values এর একটি হচ্ছে Promoting welfare and justice [iii]: মানুষের কল্যাণ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা। পাশ্চাত্যের ন্যায় বিচার প্রসঙ্গে কিছু কথা থাকলেও এই কথা সকলেই স্বীকার করেন যে জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ রয়েছে। যাদের থাকার বাসস্থান নেই তাদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা। যাদের উপার্জন নেই তাদের ভরণপোষণের জন্য ভাতা প্রদান ইত্যাদি কর্মসূচি রয়েছে। কুরআন-হাদিস অধ্যয়ন থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার যে ইসলামের মূল শিক্ষাই হচ্ছে মানবতার কল্যাণ ও আদল প্রতিষ্ঠা। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে এই কথাই বলা হয়েছে যে, "মুসলমানদের সৃষ্টি মানবতার কল্যাণের জন্য। রসুলে কারিম সালালাহু আলাইহি ওয়াসালাম হচ্ছেন, "রাহমাতালুল লিল আলামীন- সারা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত।" তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষনা করেছিলেন যে, "যেসব ঋণগ্রহীতা মারা যায় এবং তার ঋণ পরিশোধের সামর্থ্য নেই আমিই তার যিম্মাদার।" তিনি আরও বলেছেন যে, "সে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন নয় যে পেট ভর্তি করে খায় আর তার প্রতিবেশী অভুক্ত থাকে।" তিনি জুলুম করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "মাজলুমের প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন।" তিনি আরও বলেছেন যে, "একটি শিংযুক্ত গরু যদি শিং বিহীন গরুকে দুনিয়াতে আঘাত করে কেয়ামতের দিন এরও প্রতিশোধ নেওয়া হবে।" তিনি আরও বলেছেন যে, "কোন প্রাণীকে তার ধারণ ক্ষমতার বেশি বোঝা চাপিয়ে দেওয়া জুলুম।" এইভাবে ইসলামের মূল শিক্ষা সমুহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলামের মূল কথাই হচ্ছে ফালাহ কল্যাণ সাধন। এই কারণে মুয়াজ্জিন আযানের সময় সালাহ তথা নামাজের প্রতি আহ্বানের সাথে সাথে ফালাহ তথা কল্যাণের প্রতিও আহ্বান জানায়। এই কথা ঠিক যে, মুসলমানদের জন্য নামাজের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে ইসলাম কল্যাণ কামনার শিক্ষাই সকল মুসলমানদেরকে প্রদান করে।

১০.ইসলামের যথার্থ অনুসরণের মাধ্যমে সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে নিজেদেরেকে পেশ করা : একজন মুসলমান হিসেবে পাশ্চাত্যের কাছে ইসলামের সুমহান আদর্শকে তুলে ধরার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আমাদের ওপর। ইসলামের অনুসারীরা তার আপন চারিত্রিক মাধুর্য দিয়েই মানুষকে এই ধর্মের দিকে আকৃষ্ট করেছিলো। ইসলাম সম্পর্কে অপপ্রচার চালিয়ে যে ধুম্রজাল তৈরি করা হয়েছে তার মোকবেলা কেবলমাত্র বাকশক্তি বা প্রচারমাধ্যমে দিয়ে করা সম্ভব নয়। পাশ্চাত্যের ভালো কূটকৌশলও আছে মানুষকে বিতর্কে জড়িয়ে দিয়ে মূল লক্ষ্য থেকে তাদের সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে। এটি মুসলমানদের ক্ষেত্রে আরও বেশি শক্তভাবে প্রয়োগ করা হয়। ফলে আমরা নিজেদের ওজর খায়ের করতে করতেই সময় পার করে দেই। আমরা সন্ত্রাসী নই, আমরা মডারেট মুসলমান, যারা চরমপন্থী তারা ইসলামের মূলধারার সাথে নেই। এধরনের দোষচর্চা আমাদের চলতেই থাকে। এক্ষেত্রে একমাত্র অবলম্বন হতে পারে চরিত্রে মাধম্যে বিরোধিতার জয় করা। একারণে চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করা দরকার মুসলমানদের। আমরা যে পরিমণ্ডলে থাকি না কেনো সেখানেই ইসলামের সৌন্দর্যকে তুলে ধরা দরকার। কাজের স্থলে আমাদের চেষ্টা করা দরকার যাতে তাতে আমরা ফাঁকি না দেই। বিশ্বস্ততা বজায় রাখি। অর্থাৎ সত্যের সাক্ষ্য হিসাবে নিজেকে পেশ করা।

১১. হীনমন্যতাবোধ নয় বরং ইসলামী আদর্শের প্রতি অবিচল আস্থা থাকা : মুসলিম বিরোধী প্রচারণার ফলে দুর্বলচেতা মুসলমানদের কারো কারো মাঝে মুসলিম নাম বদলের মত হীনমন্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেসব মুসলিম মহিলা স্কার্ফ পরিধান করতেন তাদের কেউ কেউ তা ছেড়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করছেন না। মুসলমানদের একটি অংশের মাঝে এই আত্মবিশ্বাস নেই যে ইসলামের সত্যিকার অনুসরণকারীরা কখনও অন্যায়-দুষ্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত নয়। যারা এই ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত তাদের বাহ্যিক পরিচয় মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান বা ইহুদি হলেও তাদের আসল পরিচয় তারা সন্ত্রাসী বা দুষ্কৃতিকারী। এই ধরনের দুষ্কৃতিকারীরা সমাজে অনিষ্ট সৃষ্টি করে। তাই অনিষ্ট সৃষ্টিকারীদেরকে সকলেই মিলে শান্তি ও কল্যাণের পথে আনার চেষ্টা করতে হবে। এই জন্য ধর্মীয় বিশ্বাস বা অনুশাসন মেনে চলাকে ছেড়ে দেওয়া যৌক্তি নয়। বরং আদর্শের ঠিক জ্ঞান ও যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমেই এই সত্য তুলে ধরা প্রয়োজন যে, ইসলামী আদর্শ বা অন্যান্য ধর্মে বিশ্বাসী ও ধর্মের সঠিক অনুসারীরা কখনও সামাজিক বিশৃংখলার সাথে সম্পৃক্ত নয়।

১২. রিলিফ ও চ্যারিটি কাজ করা: মুসলমানদের কাজ শুধু দান গ্রহণ করা নয় বরং সমাজ ও মানবতার কল্যাণে অর্থ ব্যয় করা ইসলামেরই শিক্ষা। বর্তমানে দুনিয়াতে বড়ো ধরনের জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, টর্নেডোসহ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে যেসব সংস্থা প্রযুক্তি ও বস্তুগত সহযোগিতার জন্য প্রথমেই দৌড়ে যায় তার মধ্যে মুসলিম চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান খুবই কম। এমনকি মুসলিম দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ হলেও পাশ্চাত্যের সাহায্য সংস্থা প্রথমেই ছুটে যায়। অথচ ইসলামের মূল দর্শনই হচ্ছে চ্যরিটি। অর্থাৎ কাউকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে না পারলেও অন্তত কথার মাধ্যমে সন্তুষ্ট করাটাও চ্যরিটি।

১৩. কমিউনিটি ও সোশাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম : আমরা যেখানেই বসবাস করি না কেন কমিউনিটির উন্নয়নে ভূমিকা পালন করতে হবে। এই জন্য প্রথমেই কম্যুউনিটির সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে। তারপর উক্ত সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এই জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট ডেভেলপ করতে হবে এবং অন্যদের সাথে নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ফান্ড যোগাড় করতে হবে। যেমন আমাদের কমিউনিটিতে হাউজিং, শিক্ষা, ড্রাগ, অপরাধসহ পরিবেশগত অনেক সমস্যা রয়েছে। এই সব সমস্যা সমাধানে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে।

১৪. ডায়ালগ ফোরাম: ইউরোপ হচ্ছে বহু ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের মিলন মেলা। ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে কমন ইস্যুতে সকল ধর্মাবলম্বী মানুষ ঐক্যবদ্ধ ভাবে সমাজ ও মানবতার কল্যানে ভূমিকা রাখা। এইজন্য সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের মাঝে ডায়ালগ হওয়া জরুরি। কিন্তু অন্যান্য ফেইথ গ্রুপের সাথে ডায়ালগ করার জন্য মুসলমানদের তেমন কোন ফোরাম নেই। তাই এই জন্য কিছু ডায়ালগ ফোরাম করা যেতে পারে।

১৫. মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মানবিক দায়িত্ব পালন: সকল মত

ও পথের মানুষদেরকে নিয়েই সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে হবে। সমাজে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পরবর্তী প্রজন্মকে আদর্শ মানুষ হিসাবে গড়ে তোলতে হবে। ড্রাগসহ সকল ধরনের খারাপ জিনিসগুলো থেকে সমাজকে মুক্ত রাখতে হবে। ন্যয় ও ইনসাফের নীতিমালার ভিত্তিতে সমাজ যেন পরিচালিত হয় এই জন্য সকলকেই ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে হবে।

১৬.তরুণ প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করা: ইউরোপে অবস্থানরত মুসলমানদের মধ্যে জন্মসূত্রে অনেক ইউরোপীয়ান তরুণ মুসলিম রয়েছে। ইউরোপে মুসলিম ইয়ুথদের সংখ্যা তুলনামুলকভাবে বেশি। মুসলিম দেশগুলোতে জন্মগ্রহণকারী শিশুরা জন্মসূত্রে মুসলিম হয়ে জন্মগ্রহণ করার পর পরিবার, পরিবেশ ও প্রতিষ্ঠান থেকে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পায়। কিন্তু পাশ্চাত্যে জন্মগ্রহণকারী শিশুরা যে পরিবেশে বড়ো হয় সেই পরিবেশে ইসলাম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার সুযোগ কম। তাদের মধ্যে মুসলিম পরিচয় ও স্বকীয়তার সঠিক ধারণা নেই। তারা বড়ো হয়ে স্কুল-কলেজে পড়াশুনা করার সময় কিংবা কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষা-ভাষী ও ধর্মের মানুষের সাথে মেশার সময় বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়। এসব প্রশ্নের সঠিক জবাব না পেয়ে অনেক সময় তারা ইসলাম সম্পর্কে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে; তাই এই ধরনের তরুণদেরকে ইসলামের আলোকে গড়ে তোলা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।

১৭.অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াহ কাজ: মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াহ কাজের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশোধন, উন্নয়ন ও দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা। দ্বীনের দিকে দাওয়াহর আসল লক্ষ্য হচ্ছে অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়া। অমুসলিম দেশে বসবাসকারী মুসলমানদেরকে আল্লাহ তায়ালা এর মহান সুযোগ করে দিয়েছেন। একজন অমুসলিমকে দ্বীনের পথে আনতে পারলে তার সারা জীবনের আমলের সওয়াবের অংশীদার হবে দাওয়াহ দানকারী। এরচেয়ে বড়ো নেক আমল আর কি হতে পারে? অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াহর সফলতার জন্য তাদের ভাষা ও মন মানসিকতা জানা জরুরি। দাওয়াহ কাজের সফল পদ্ধতি সমূহ আয়ত্ত করা একান্ত জরুরি। মুসলমানদের মধ্যে দাওয়াহ কাজের পদ্ধতি সমূহ অমুসলিমদের জন্যও প্রযোজ্য, যদিও তার কনটেন্ট ও উপস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন আনা জরুরি হতে পারে।

১৮. নতুন মুসলমানদের জন্য সাপোর্ট: ইসলামের রূপ সৌন্দর্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অনেকেই প্রতি বছর ইসলাম কবুল করেন। কিন্তু কনভার্টেড মুসলমানদেরকে ইসলামী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদান এবং প্রয়োজনীয় সাপোর্ট প্রদানের জন্য কার্যকর সংস্থা ও সিস্টেম এখনও গড়ে উঠে নাই। ২০১০ সালে বৃটেনে A Minority Within a Minority: a Report on Converts to Islam in the United Kingdom শীর্ষক এক সার্ভে করা হয়। উক্ত সার্ভে রিপোর্টের কিছু দিক বিগত ২৯ শে ডিসেম্বর ২০১০ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত দি টাইমস পত্রিকায় Ruth Gledhill কর্তৃক Caught between cultures : how muslim converts are left to fend themselves শীর্ষক প্রতিবেদনে উলেখ করা হয়। তিনি তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেন যে, Thousands of British Muslim converts are cast adrift by their communities and offered inadequate support by mosque, according to an unpublished report seen by the Times

মূলত অনেক অমুসলিম ইসলাম গ্রহনের পর নিজের পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যেতে হয়। তাদের জন্য নানা ধরনের সাপোর্ট দরকার হয়। প্রথম পর্যায়ে তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান করা জরুরি হয়। কিন্তু কনভার্টেড মুসলমানদেরকে ইসলামী মুল্যবোধ ও কালচার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়ার সীমিত কিছু প্রজেক্ট বিভিন্ন সেন্টারে থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় নেহায়েতই অপ্রতুল। এছাড়া তাদের কাউকে কাউকে সাময়িকভাবে হলেও থাকার ব্যবস্থা করা জরুরি হয়ে পড়ে। কিন্তু এই ধরনের ব্যবস্থা নেই বললেই চলে।

১৯. আদর্শ পরিবার গঠন : পাশ্চাত্যে বস্তুগত উন্নতি ও উৎকর্ষতা সাধিত হলেও নৈতিকতা ও পারিবারিক মূল্যবোধ দিন দিন কমে যাচ্ছে। পারিবারিক জীবনে শান্তি, স্থিতি, মায়ার বন্ধন, ভালবাসা ও মধুময় জীবনের অভাবে অনেকে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েও রাস্তায় ঘুমায়। তাদের ঘর, বাড়ি, সম্পদ ও বিত্ত বৈভরে অভাব নেই। অভাব হচ্ছে শান্তির। স্বামী-স্ত্রী বা পার্টনার দুইজনই শপিং করার জন্য যাওয়ার পর সামান্য বিষয় নিয়ে কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে একে অপরকে ধাক্কা মেরে বৈবাহিক জীবন বা পার্টনারশীপের ইতি ঘটিয়ে কুকুরকে সাথে নিয়েই বাসায় ফিরে আসে। অতি সামান্য বিষয় নিয়েও সম্পর্কচ্ছেদ করতে দ্বিধা করে না। পাশ্চাত্যে বিবাহের সংখ্যা দিন দিন কমছে এবং লীভ টুগেদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৪ সালে ২.২ মিলিয়ন ছিল Cohabiting couple আর ০.৫ মিলিয়ন ছিল বিবাহিত দম্পতি এবং Lone mother family ছিল ২.৩ মিলিয়ন। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, যেসব মা একা একা সন্তান বড়ো করার দায়িত্ব পালন করে তারা সব সময় দুশ্চিন্তায় থাকে। এর ফলে তাঁরা প্রায়ই শারীরিক ও মানসিক অশান্তিতে থাকেন। আরেক গবেষণা থেকে জানা যায় যে, যেসব ছেলে-মেয়েরা পিতার সাহচর্য পায় না তারা স্কুলে বেশি দুষ্টমি করে। পিতা-মাতার পারস্পরিক ঝগড়ার (Domestic violence) কারণে যেসব সন্তান পিতা-মাতার সাথে থাকতে পারে না তারা অল্প বয়সেই এ্যালকোহল আসক্ত হয়। তারা স্কুলে ঠিকমত পড়াশুনা করে না এবং নানা ধরনের অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত হয়। তাদের behavior problem থাকে। তাদের অনেকেই অল্প বয়সেই Sexual health problem ভোগ করে। আর কিশোরী মেয়েরা অল্প বয়সেই গর্ভধারণ করে মা হয়ে যায়। ফলে তাদের পড়াশুনা বন্ধ করতে হয়।

ইসলামে পারিবারিক জীবনের মূল ভিত্তি দাম্পত্য জীবন। আর ইসলামে পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ক. শান্তি ও তৃপ্তি লাভ খ. ভালবাসা ও বন্ধুত্ব, গ. বংশ বৃদ্ধি, ঘ. লজ্জাস্থানের হেফাজত। এই প্রসঙ্গে সুরা রূমের ২১ ও ৩০ নম্বর আয়াত, সুরা আরাফের

১৮৯ নম্বর আয়াতের তাফসীর এবং হাদিসের কিতাবুন নিকাহ এর সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ পাঠ করার জন্য আমি পাঠক/পাঠিকাকে অনুরোধ করছি। ইসলামে পারিবারিক জীবনের যেসব দিক নির্দেশনা রয়েছে তা অনুসরণ করে মডেল পরিবার গঠন করা মুসলমানদের দায়িত্ব । কেননা আদর্শ পারিবারিক জীবনই সমাজ ও সভ্যতা বিনির্মানের মূল ভিত্তি। পারিবারিক জীবনে অশান্তি থাকলে অঢেল সম্পদ থাকলেও মনে শান্তি আসে না; রাতে ঘুম হয় না। দুঃখ-যাতনা নিয়েই দিনাতিপাত করতে হয়। আর পারিবারিক জীবনে শান্তি পেতে হলে আমাদেরকে আল্লাহর রসুলের উসওয়া-আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

২০.ফিকহী ইখতিলাফ যেন মুসলিম কমিউনিটির ঐক্যে প্রতিবন্ধক না হয় : মুসলিম হিসাবে একজন মুসলমানের প্রতি আরেকজন মুসলমানের দায়িত্ব রয়েছে। ইসলামের যথাযথ অনুশীলনের ক্ষেত্রে এক মুসলমান আরেক মুসলমানকে সহযোগিতা করতে হবে। মুসলমানরা কে কোন দেশী কিংবা কে কোন বর্ণের বা কে কোন ভাষায় কথা বলে তা বিবেচ্য বিষয় নয়। যারাই এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে খাতামুন্নাবীয়্যীন হিসাবে স্বীকার করেন এবং কুরআনকে হেদায়েতের উৎস হিসাবে স্বীকার করেন এবং একই কিবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ পড়েন তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ফিকহী ইখতিলাফ এর কারণে মুসলমানদের মাঝে অনৈক্য বিদ্যমান। মুসলমানদেরকে ফিকহী বা ক্ষুদ্র রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে ইউরোপে একটি মুসলিম কমিউনিটি গঠনের চেষ্টা করতে হবে। এই ক্ষেত্রে ফিকহী বিভিন্ন বিষয়ে ইখতিলাফ কমিয়ে আনা এবং মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সঠিক কর্মপন্থা কি হবে সে সম্পর্কে মুসলমানদের সঠিক জ্ঞান অর্জন করা দরকার। শাইখ দেহলবীর মতে কয়েকটি কারণে উপরিউক্ত ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়: ১. রসুলের হাদিস জানা থাকা আর না থাকার পার্থক্যের কারণে ২. রসুলের কাজের ধরন নির্ণয়ের পার্থক্যের কারণে ৩. ধারণাগত বিশ্লেষণের পার্থক্যের কারণে ৪. রসুলুল্লাহ (সা.) এর বক্তব্যের ঠিক উদ্দেশ্য আয়ত্ত করা আর না করার পার্থক্যের কারণে ৫. ভুলে যাওয়ার কারণে ৬. বিধানের কল্যাণ নির্ণয়ে পার্থক্যের কারণে ৭. সামঞ্জস্যবিধানত পার্থক্যের কারণে। ইসলামের বিভিন্ন বিধান এর ব্যাখ্যায় ইখতিলাফ হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বর্তমানে উক্ত ইখতিলাফ এর কারণে কখনও কখনও ইফতিরাক তথা বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হতেও দেখা যায়। আবার কখনও কখনও দল বা ঝগড়া বিবাদও দেখা যায়। এর কোনটাই কাম্য নয়।

লেখক: বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক,

ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য, মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন।

কো-অর্ডিনেটর, মেইনল্যান্ড ইউরোপ।

এসো শাশ্বত সুন্দরের পথে (দাওয়াত)

নাজমুন নাহার

আজকে আমি আপনাদেরকে দাওয়াত নিয়ে কিছু কথা বলব। কি দাওয়াত শুনেই জিবে পানি চলে আসল? পোলাও, কোরমা, রেজালা, জর্দা এগুলোর কথা মনে হচ্ছে। আপনি আশাহত হবেন আমি এমন কোন মুখরোচক রসালো দাওয়াতের কথা বলছি না, তবে হ্যাঁ আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারি যদি আপনি এই দাওয়াত গ্রহণ করে সামনে এগিয়ে যান তাহলে পোলাও, কোরমা এর চাইতেও অনেক মাজাদার কিছু আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

আমি আপনাদেরকে আজ আল্লাহর দিকে আহ্বান বা দাওয়াতের কথা বলছি।

শাব্দিক অর্থ

দাওয়াত دَعۡوَةٌ শব্দটি এসেছে আরবী د ع و দাল, আইন, ওয়াও হরফ থেকে। কোরআনে মোট ২১২ বার এই শব্দটি এসেছে এবং বিভিন্ন অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

১। দোয়া বা প্রার্থনা অর্থে:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةٗ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٨

এ অবস্থা দেখে জাকারিয়া তার রবের কাছে প্রার্থনা করলো, "হে আমার রব! তোমার বিশেষ ক্ষমতা বলে আমাকে সৎ সন্তান দান করো। তুমিই প্রার্থনা শ্রবণকারী।" (সুরা ইমরান: ৩৮)

২। ডাকা অর্থে:

وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِيٓ أَسۡمَٰٓئِهِۦۚ سَيُجۡزَوۡنَ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٨٠

"ভাল নামগুলো আল্লাহর জন্য নির্ধারিত। সুতরাং ভাল নামেই তাঁকে ডাকো এবং তাঁর নাম রাখার ব্যাপারে যারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদেরকে বর্জন কর। তারা যা কিছু করে এসেছে, তার ফল অবশ্যই পাবে।" (আল আরাফ: ১৮০)

৩। চাওয়া অর্থে:

لَهُمۡ فِيهَا فَٰكِهَةٞ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ٥٧

"সব রকমের সুস্বাদু পানাহারের জিনিস তাদের জন্য সেখানে রয়েছে, যা কিছু তারা চাইবে তা তাদের জন্য হাজির রয়েছে।" (সুরা ইয়াসিন: ৫৭)

৪। কথা অর্থে:

فَمَا كَانَ دَعۡوَىٰهُمۡ إِذۡ جَآءَهُم بَأۡسُنَآ إِلَّآ أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ ٥

"আর যখন আমার আযাব তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল তখন তাদের মুখে এছাড়া আর কোন কথাই ছিল না যে, "সত্যিই আমরা জালেম ছিলাম।" (সুরা আল আরাফ: ৫)

৫। আর্তনাদ অর্থে:

فَمَا زَالَت تِّلۡكَ دَعۡوَىٰهُمۡ حَتَّىٰ جَعَلۡنَٰهُمۡ حَصِيدًا خَٰمِدِينَ ١٥

"আর তারা এ আর্তনাদ করতেই থাকে যতক্ষণ আমি তাদেরকে কাটা শস্যে পরিণত না করি, জীবনের একটি স্ফুলিঙ্গও তাদের মধ্যে থাকেনি।" (আল আম্বিয়া: ১৫)

৬। জিজ্ঞাসা অর্থে:

قَالُواْ ٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوۡنُهَاۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٞ

صَفۡرَآءُ فَاقِعٞ لَّوۡنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّٰظِرِينَ ٦٩

"আবার তারা বলতে লাগলো, তোমার রবের কাছে আরও জিজ্ঞেস করো, তার রঙটি কেমন? মুসা জবাব দিল, তিনি বলছেন, গাভীটি অবশ্যি হলুদ রংয়ের হতে হবে, তার রং এতই উজ্জ্বল হবে যাতে তা দেখে মানুষের মন ভরে যাবে।" (সুরা আল বাকারা: ৬৯)

৭। আহ্বান অর্থে:

لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدۡعُونَنِيٓ إِلَيۡهِ لَيۡسَ لَهُۥ دَعۡوَةٞ فِي ٱلدُّنۡيَا وَلَا فِي ٱلۡأٓخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِ ٤٣

"না, সত্য হচ্ছে এই যে, তোমরা যেসব জিনিসের দিকে আমাকে ডাকছো, তাতে না আছে দুনিয়াতে কোন আবেদন না আছে আখেরাতে কোন আহ্বান। আমাদেরকে আল্লাহর দিকেই ফিরে যেতে হবে। আর সীমালঙ্ঘনকারী আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। এর ব্যতিক্রম হতে পারে না।" (সুরা গাফির: ৪৩)

ডাকা বা আহ্বান অর্থেই কোরআনে দাওয়াত শব্দটি সবচেয়ে বেশি এসেছে।

পারিভাষিক অর্থ: দাওয়াতের পারিভাষিক অর্থ প্রধানত বলা হয় "মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলার দিকে মানুষকে ডাকা।"

আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা সুরা ফুসসিলাত ৩৩ নং আয়াতে বলেন,

وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٣٣

"সেই ব্যক্তির কথার চেয়ে আর কার কথা উত্তম হবে যে আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকলো, সৎ কাজ করলো এবং ঘোষণা করলো আমি মুসলমান।" (সুরা ফুসসিলাত: ৩৩)

একজন মানুষের মুখ দিয়ে যত ধরনের সুন্দর বা ভাল কথা বের হতে পারে তার মাঝে সবচেয়ে উত্তম কথা হচ্ছে আল্লাহর পথে মানুষকে ডাকা । সুবহানাল্লাহ। আমাদের উচিত নিজের জবানকে সারাক্ষণ এই উত্তম কথার মাঝে সিক্ত রাখা।

এছাড়াও অন্যান্য আলেমেদ্বীন গণ দাওয়াতের আরও অনেক পারিভাষিক অর্থ করেছেন। যেমন:

১। মানুষকে কল্যাণ ও হেদায়েতের দিকে আহ্বান করা এবং সৎকাজের আদেশ দান এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা এবং মূর্খতা ও অন্যায় থেকে রক্ষা করা। (শেখ মুহম্মদ খিদরী হুসাইন, আদ-দাওয়াহ ইলাল ইসলাহ। পৃষ্ঠা ১৭)

২। দাওয়াত অর্থ মানুষের চরিত্র সংশোধনের পদ্ধতি ও পরিপূর্ণ একটি জীবন ব্যবস্থা, যা বাস্তবায়নের জন্য আল্লাহ মুহম্মদ (সা.) কে প্রেরন করেছেন এবং তার প্রতি মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন। যা করা বা করার মধ্যে রয়েছে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা। (মুহম্মদ গালুস, আদ-দাওয়াহ আল-ইসলামিয়া অসুলুহা অ-অসায়িলুহা, পৃষ্ঠা ১৩)

৩। সামর্থ্য অনুযায়ী দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের দিকে জ্ঞানী মানুষদের পক্ষ থেকে সাধারন মানুষদেরকে ডাকা। (আবু বকর যিকরী, দাওয়াহ ইলাল ইসলাম, পৃষ্ঠা ৮)

৪। আল্লাহ্ ও তার রসুল (সা.) প্রণীত জীবন ব্যাবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান করা।

সকল নবী রসুলদের মৌলিক কাজ ছিল তার জাতিকে দাওয়াত দেওয়া

রসুল (সা.) সহ সকল নবী রসুলদের মৌলিক কাজই ছিল আল্লাহর দিকে তার জাতি বা উম্মতকে ডাকা।

সুরা শুরার ১৩ আয়াতে বলেছেন:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣

"তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নুহকে, আর যা আমি ওহি করেছি আপনাকে এবং যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা এবং ঈসাকে, এ বলে যে, তোমরা দ্বীন প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা করো না। আপনি মুশরিকদের যার প্রতি আহ্বান করছেন তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয়।" (সুরা শুরা: ১৩)

সুরা আরাফে ৮ম রুকু বা ৫৯ আয়াত থেকে প্রতিটি রুকুতে এক এক নবীর বর্ণনা করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রথম কথা ছিল يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ (ইয়া কওমী বুদুল্লাহ) "হে জাতির লোক সকল এক আল্লাহর ইবাদত কর।

৫৯ আয়াতে নুহ (আ.)

لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوۡمِهِۦ فَقَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ

৬৫ নং আয়াতে হুদ (আ.)

وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمۡ هُودٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ

৭৩ নং আয়াতে সালেহ (আ.)

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمۡ صَٰلِحٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ

৮৫ নং আয়াতে শুয়াইব (আ.)

وَإِلَىٰ مَدۡيَنَ أَخَاهُمۡ شُعَيۡبٗاۚ قَالَ يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ

এক এক নবী এক এক সময় এসেছেন, কারো সাথে কারো কোন প্রকার যোগাযোগ নেই, কে কি কথা বলেছেন তা কারো জানার কোন সুযোগ নেই, তারপরও সবার দাওয়াত ছিল এক يَٰقَوۡمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ "হে জাতি এক আল্লাহর ইবাদত কর।" ইসলাম যে একটি সত্য জীবন বিধান তার এক বাস্তব প্রমাণ এই সব নবীদের দাওয়াত ছিল এক।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা রসুল (সা.) কে অনেকবার এই দাওয়াতের নির্দেশ দিয়েছেন।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ

"হে রসুল! আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার উপর যা অবতীর্ণ হয়েছ তা আপনি প্রচার করুন। যদি আপনি তা না করেন তাহলে আপনি আল্লাহর বার্তা প্রচার করলেন না।" (সুরা মায়েদা : ৬৭)

মহান আল্লাহ রসুল (সা.) কে আরও বলেন,

"আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।" (সুরা নাহল: ১২৫)

উম্মতে মুহম্মদী হিসেবে আমাদের দায়িত্ব দাওয়াত দান

রসুল (সা.) এর পর আর কোন নবী আসবে না। তাই উম্মতে মুহম্মদী হিসেবে এই নবীওয়ালা কাজ এখন আমাদের করতে হবে। যার নির্দেশ আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা দিয়েছেন এবং রসুল (সা.) আমাদের দিয়ে গেছেন।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা নির্দেশ দেন,

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠٤

"আর যেন তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভাল কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।" (সুরা আলে ইমরান: ১০৪)

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ ١١٠

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা ন্যায়কার্যে আদেশ এবং অন্যায় কার্যে নিষেধ কর এবং আল্লাহতে বিশ্বাস কর।" (সুরা আলে ইমরান: ১১০)

প্রকৃত মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন:

يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُسَٰرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَٰتِ ۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ ١١٤

"তারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে এবং তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর তারা কল্যাণকর কাজে দ্রুত ধাবিত হয় এবং তারা নেককারদের অন্তর্ভুক্ত।" (সুরা আলে ইমরান: ১১৪)

আমাদের প্রিয় রসুল মুহম্মদ (সা.) আমাদেরকে এই দাওয়াত দানের নির্দেশ খুব জোড়ালো ভাবে দিয়ে গেছেন।

তিনি বলেন:

كَلَّا وَاللهِ لَتَأمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمَنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلى الْحَقِ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلى الْحَقِ قَصْرًا أو لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعضِكُمْ عَلى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ (رواه ابو داود

"মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎ কর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাত ধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন।" (আবু দাউদ)

রসুল (সা.) এর নির্দেশ, তিনি বলেন: "আমার কাছ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছিয়ে দাও।" (সহিহ বুখারি: ৩৪৬১)

বিদায় হজের শেষ ভাষণে তিনি (সা.) বলেন,

فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَاءِبَ (احمد, ترمزي)

"হে উপস্থিত সাহাবিরা, তোমরা অনুপস্থিত উম্মতের কাছে আমার বাণী পৌঁছে দেবে।" (তিরমিজি, আহমাদ)

তাই আল্লাহর পথে সবাইকে আহ্বান করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব।

দাওয়াতের শরয়ী মর্যাদা: প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আল্লাহর দিকে মানুষকে ডাকা ফরজ। নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত যেমন ফরজ। কেয়ামাতের কঠিন দিনে যেমন এই ফরজ গুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করা হবে ঠিক তেমনি আমাদের এই দাওয়াতের ব্যাপারেও প্রশ্ন করা হবে।

হাদিসে এসেছে:

لا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ نَفْسَهُ أَنْ يَرَى أَمْرَ اللهِ عَلَيْهِ فِيهِ مَقَالاً ثُمَّ لا يَقُوْلُهُ فَيَقُولُ اللهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَقُولَ فِيهِ فَيَقُولُ رَبِّ خَشِيتُ النَّاسَ فَيَقُولُ وأَنَا أَحَقُّ أَنْ يُخْشَىَ (رواه أحمد. وسنده صحيح)

রসুল (সা.) বলেছেন, "তোমাদের কেউ যেন নিজেকে ছোট মনে না করে। সে যদি দেখে যে কোথাও কোনো বিষয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কোনো কথা বলা উচিত তখন যেন সে কথা বলা থেকে বিরত না থাকে। কারণ আল্লাহ তাকে সেদিন জিজ্ঞেস করবেন, তুমি এ বিষয়ে কেন কথা বলনি? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি মানুষদেরকে ভয় পেয়েছিলাম। তখন তিনি বলবেন, আমার অধিকারই তো বেশি ছিল যে, তুমি আমাকেই বেশি ভয় করবে।" (আহমাদ, সনদ সহিহ)

তাই এই ফরজ কাজ বাদ দিয়ে কেউ প্রকৃত ঈমানদার হতে পারবে না। আমাদের সবাইকে এই দাওয়াতের জন্য চেষ্টা সাধনা বা মুজাহাদা করতে হবে।

কিসের দিকে ডাকব?

আমাদের দাওয়াত হবে প্রত্যেকের প্রতি "এক আল্লাহর ইবাদত করার" দাওয়াত।

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٦٤

বল, হে আহলি কিতাব! এসো এমন একটি কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই ধরনের। তা হচ্ছে, আমরা আল্লাহ ছাড়া কারোর বন্দেগী ও দাসত্ব করবো না। তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আর আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও নিজের রব হিসেবে গ্রহণ করবে না। যদি তারা এ দাওয়াত গ্রহণ করতে প্রস্তুত না হয়, তাহলে পরিষ্কার বলে দাওঃ "তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা অবশ্যই মুসলিম (একমাত্র আল্লাহর

বন্দেগী ও আনুগত্যকারী)।" (সুরা ইমরান: ৬৪)

রসুল (সা.) যখন প্রকাশ্যে দাওয়াত দেওয়ার জন্য সাফা পাহাড়ে উঠে যে দাওয়াত দিয়েছিলেন তা ছিল,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ

"হে মানুষ তোমরা বল আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই।"

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যারা মুসলমান নয় তাদের কেই এই দাওয়াত দিতে হবে। কিন্তু আজ অনেক মুসলমান আছেন তারা শুধু জন্ম নিয়েছেন মুসলমান পরিবারে কিন্তু তাদের চলাফেরা, আচার আচরণের ক্ষেত্রে তারা জানেন না এবং মানেন না ইসলামের অনেক বিধি বিধান। তাই তাদের মাঝেও দাওয়াত বা ইসলাহ অর্থাৎ সংশোধনের জন্য দাওয়াত দিতে হয়।

দাওয়াতি কাজ না করার পরিণতি:

১। দুনিয়াবী শাস্তি:

আল্লাহর দিকে আহ্বান না করলে আল্লাহ্ তাদের দুনিয়াতেই তাঁর আজাব দ্বারা পাকরাও করবেন।

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُوا۟ مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٤٦١ فَلَمَّا نَسُوا۟ مَا ذُكِّرُوا۟ بِهِۦٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوٓءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ بِعَذَابٍۭ بَـِٔيسٍۭ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٥٦١

"আর স্মরণ কর, যখন তাদের একদল বলল, তোমরা কেন উপদেশ দিচ্ছ এমন কওমকে, যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন অথবা কঠিন আজাব দেবেন? তারা বলল, তোমাদের রবের নিকট ওজর পেশ করার উদ্দেশ্যে। আর হয়তো তারা তাকওয়া অবলম্বন করবে। অতঃপর যে উপদেশ তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, যখন তারা তা ভুলে গেল তখন আমি মুক্তি দিলাম তাদেরকে যারা মন্দ হতে নিষেধ করে। আর যারা জুলুম করেছে তাদেরকে কঠিন আজাব দ্বারা পাকড়াও করলাম। কারণ তারা পাপাচার করত।" (সুরা আরাফ: ১৬৪-১৬৫)

যারা দাওয়াত দিবে না এবং দাওয়াত পাওয়ার পর ও মানবে না তাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করবেন।

রসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

إنَّ النَّاسَ إذَا رأوا الْمُنْكَرَ لا يُغَيِّرُونَهُ أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بعقابِهِ
(رواه الترمذي و ابوداود وابن ماجه واحمد بسند صحيح

"যখন মানুষেরা অন্যায় দেখেও তা পরিবর্তন বা সংশোধন করবে না তখন যে কোন মুহূর্তে আল্লাহর শাস্তি তাদের সবাইকে গ্রাস করবে।" (তিরমিজি, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, মুসনাদে আহমাদ)

অন্য হাদিসে রসুলুল্লাহ (সা.) এরশাদ করেন:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يَقْدِرُونَ على أنْ يُغَيِّرُوا عَلَيْهِ فَلَا يُغَيِّرُوا إلَّا أصَابَهُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِ أنْ يَمُوتُوا.(رواه ابوداود حسن

"কোনো সমাজের মধ্যে যদি কোনো ব্যক্তি অবস্থান করে সেখানে অন্যায় পাপে লিপ্ত থাকে এবং সে সমাজের মানুষেরা তার সংশোধন-পরিবর্তন করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা না করে, তবে তাদের মৃত্যুর পূর্বেই আল্লাহর আজাব তাদেরকে গ্রাস করবে।" (আবু দাউদ, হাদিসটি হাসান)

২। দোয়া কবুল হবে না

রসুল (সা.) বলেছেন:

وَالذي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أوْ لَيُوشِكَنَّ اللهُ أنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ
(رواه الترمذي حسن

"যার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! তোমরা অবশ্যই কল্যাণের আদেশ করবে এবং মন্দ থেকে নিষেধ করবে, তা না হলে আল্লাহ অচিরেই তোমাদের সবার উপর তাঁর গজব ও শাস্তি পাঠাবেন, তারপর তোমরা আল্লাহকে ডাকবে, কিন্তু তোমাদের ডাকে সাড়া দেওয়া হবে না বা তোমাদের দোয়া কবুল করা হবে না।" (তিরমিজি, হাসান সূত্রে)

৩। শত্রুতা সৃষ্টি ও অভিশপ্ত:

রসুল (সা.) বলেন:

كَلَّا وَاللهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ أطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ قَصْرًا أو لَيَضْرِبَنَّ اللهُ بِقُلُوبِ بَعضِكُمْ على بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ (رواه ابو داود وغيره

"মহান আল্লাহর কসম করে বলছি, তোমরা অবশ্যই সৎ কর্মের আদেশ করবে, অন্যায় থেকে নিষেধ করবে, অন্যায়কারী বা অত্যাচারীকে হাত ধরে বাধা দান করবে, তাকে সঠিক পথে ফিরে আসতে বাধ্য করবে। যদি তোমরা তা না কর তবে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধিতা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে দিবেন এবং তোমাদেরকে অভিশপ্ত করবেন যেমন ইসরাঈল সন্তানদেরকে অভিশপ্ত করেছিলেন। (আবু দাউদ ও অন্যান্য, সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য)

৪। গুনাহগার হবে:

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

إذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ في الْارضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا وَ قَالَ مَرَّةً أنْكَرَهَا كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْها وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا (ابو داود

যখন পৃথিবীতে কোনো পাপ সংঘটিত হয় তখন পাপের নিকট উপস্থিত থেকেও যদি কেউ তা ঘৃণা করে বা আপত্তি করে তবে সে ব্যক্তি অনুপস্থিত ব্যক্তির মত পাপ মুক্ত থাকবে। আর যদি কেউ অনুপস্থিত থেকেও পাপটির বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকে বা মেনে নেয় তাহলে সে তাতে উপস্থিত থাকার পাপে পাপী হবে। (আবু দাউদ, সনদ গ্রহণযোগ্য)।

৫। অভিশাপ বর্ষণ

রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

لا تَقُفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُقْتَلُ فَإنَّ اللعْنَةَ تَنْزِلُ عَلى مَنْ حَضَرَهُ حِيْنَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ ولا تَقُفَنَّ عِنْدَ رَجُلٍ يُضْرَبُ مَظْلُومًا فَإنَّ اللعْنَةَ تَنْزِلُ

عَلى مَنْ حَضَرَهُ (رواه أحمد وطبراني وبيهقي .

"যেখানে কোনো মানুষকে হত্যা করা হয় সেখানে কখনই দাঁড়াবে না, কারণ সেখানে উপস্থিত লোকেরা যদি তার হত্যা প্রতিরোধ না করে তাহলে সকলের উপর লানত ও অভিশাপ বর্ষিত হয়। আর যেখানে কোনো মানুষকে অত্যাচার করে মারধর করা হয় সেখানে দাঁড়াবে না। কারণ, উপস্থিত সকলের উপরেই লানত-অভিশাপ বর্ষিত হয়।" (আহমাদ, তাবারানি, বাইহাকি। বাইহাকির সনদটি হাসান)

দাওয়াতি কাজ যেমন নিজের, দুনিয়া এবং পরকালের জন্য তো প্রয়োজনই; পাশাপাশি পুরো মানবগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্যও এর কোন বিকল্প নেই।

দায়ীর বৈশিষ্ট¨

যারা এই দাওয়াতের কাজ করবেন তাদেরকে দায়ী বলা হয়। যারা এই মহান পবিত্র নবুয়তী কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করবেন তাদের অবশ্যই বেশ কিছু গুণাবলী থাকা প্রয়োজন তা না হলে দ্রব্য ভাল হলেও বিক্রেতার বিজ্ঞাপন ভাল না হবার কারনে ব্যবসায় ক্ষতি হতে বাধ্য।

ইসলামের আদর্শ সবচেয়ে উত্তম হওয়া সত্ত্বেও যারা আমরা এই আদর্শ প্রচার করতে যাচ্ছি তাদের দুর্বলতার কারনে আমরা ইসলামকে পুরো বিশ্বে আজ সন্ত্রাসী আদর্শ বানিয়ে ফেলেছি। এখান থেকে বের হতে হলে আমাদের কিছু বৈশিষ্ট¨ অর্জন করতে হবে।

রসুল (সা.) এর উন্নত গুণাবলী থাকার কারনেই মাত্র ২৩ বছরেই ইসলাম পরিপূর্ণতা পেয়েছে।

মহান আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

"(হে নবী!) এটা আল্লাহর বড়োই অনুগ্রহ যে তোমার ব্যবহার তাদের প্রতি বড়োই কোমল। নয়তো যদি তুমি রুক্ষ স্বভাবের বা কঠোর চিত্ত হতে, তাহলে তারা সবাই তোমার চার পাশ থেকে সরে যেতো। তাদের ত্রুটি ক্ষমা করে দাও। তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করো এবং দ্বীনের ব্যাপারে বিভিন্ন পরামর্শে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করো। তারপর যখন কোন মতের ভিত্তিতে তোমার স্থির সংকল্প হবে তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করো। আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন যারা তাঁর ওপর ভরসা করে কাজ করে। (সুরা আলে ইমরান : ১৫৯)

১। বিশুদ্ধ ঈমান

দায়ীর সর্বপ্রথম নিজের এক আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি বিশুদ্ধ ঈমান অর্জন ও সর্ব প্রকার শিরক, কুফর ও নিফাক থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। নিজের ঈমান মজবুত না হলে অন্যকে দাওয়াত দিলেও এর প্রভাব খুবই ক্ষণস্থায়ী। যার দাওয়াত দিব তা যদি নিজের মাঝে না থাকে তাহলে কিসের দাওয়াত দিব? এক আল্লাহ দাওয়াত মানে ঈমানের দাওয়াত তাই আগে দায়ীর এই ঈমানকে দৃঢ় হতে হবে। শিরক মুক্ত ঈমান হতে হবে। কুফর মুক্ত থাকতে হবে। মুখে এক আর অন্তরে আরেক এমন মুনাফিকি থেকে বেঁচে থাকতে হবে। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অন্তরে দৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস করতে হবে।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِى نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِن قَبْلُ ۚ وَمَن يَكْفُرْ بِٱللَّهِ وَمَلَٰٓئِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ١٣٦

"হে ঈমানদারগণ! ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসুলের প্রতি, আল্লাহ তাঁর রসুলের ওপর যে কিতাব নাজিল করেছেন তার প্রতি এবং পূর্বে তিনি যে কিতাব নাজিল করেছেন তার প্রতি। যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাবর্গ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রসুলগণ ও পরকালের প্রতি কুফরী করলো সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহুদূর চলে গেলো।" (সুরা নিসা: ১৩৬)

২। ইসলামের যথাযথ জ্ঞান অর্জন

কিসের দাওয়াত দিতে হবে সে সম্পর্কে পর্যাপ্ত সঠিক জ্ঞানের অভাবে দাওয়াতি কাজ মুনাফা না নিয়ে এসে অনেক সময় পুঁজিও হারিয়ে যায়। অনেক আলেম এ দ্বীন ঈমানের আগে জ্ঞানের কথা বলেছেন। সঠিক জ্ঞানের অভাবে এক আল্লাহর দাওয়াত দিতে যেয়ে হয়ত শিরক করা হয়ে যাচ্ছে। লালন শাই, মুর্শিদী, মারফতি তারাও ভাবেন তারা দ্বীনের দাওয়াত দিচ্ছেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তারা আল্লাহর সাথে শিরক করছেন। তাই ইসলাম ঠিক আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা যা যা বলেছেন এবং রসুল (সা.) যেভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, সেভাবেই করতে হবে। আর এর জন্যই আমাদের জানতে হবে কোনটি সঠিক।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা বলেন,

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ

অতঃপর তাদের জনবসতির প্রত্যেক অংশের কিছু লোক বেরিয়ে আসবে। তারা দ্বীন সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করবে এবং ফিরে গিয়ে নিজের এলাকার লোকদেরকে সতর্ক করবে, যাতে তারা বাঁচতে পারে। (সুরা তওবা: ১২২)

আল কোরআনে আল্লাহ আরও বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ ٩

"আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমান লোকেরাই তো নসিহত কবুল করে থাকে।" (সুরা যুমার: ৯)

রসুল (সা.) বলেছেন,

طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَي كُلِّ مُسْلِمِينَ

"হযরত আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসুলে করিম (সা.) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজ অবশ্য কর্তব্য।" (ইবনে মাজাহ)

ঈমানকে পোক্ত করতে হলেও গভীর জ্ঞানের বিকল্প নেই। ঈমান শক্ত করে দাওয়াত দিতে হলে অবশ্যই ইসলাম সম্পর্কে সব ধরনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কোরআন, হাদিসের জ্ঞান এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও সমসাময়িক জ্ঞান ও অর্জন করা জরুরি। কিন্তু কোরআন হাদিসকেই মৌলিক ভিত্তি ধরে বিজ্ঞান, দর্শনকে বুঝতে হবে।

আজ মুসলিমের জ্ঞানের পিপাসা নেই। ইতিহাসে একদিন মুসলিমরাই জ্ঞান বিজ্ঞানে ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যতদিন তারা এদিক দিয়ে এগিয়ে ছিল ততদিন তারা শাসন করেছে পুরো পৃথিবী। আর যখনই জ্ঞান চর্চা বাদ দিয়ে বিলাস ব্যসনে মুসলিম গা ভাসিয়ে দিল তখন থেকে শুরু হল মুসলমানদের পতন। সেই সোনালী যুগ আবার ফিরিয়ে আনতে জ্ঞান অর্জনের বিকল্প নেই।

৩। উন্নত চরিত্র মাধুর্য

দায়ীর অন্যতম শক্ত হাতিয়ার হল তার নির্মল সুন্দর চরিত্র। অনেক সময় মৌখিক দাওয়াতের প্রয়োজন হয় না দায়ীর সুন্দর আখলাকই অন্যকে সত্য সুন্দরের পথে নিয়ে আসে। দায়ীর চরিত্র হতে হবে রসুল (সা.) অনুকরণে। তিনিই হবেন একজন মুসলিম দায়ীর জীবনের সর্বক্ষেত্রের আইডল।

মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤

নিঃসন্দেহে তুমি নৈতিক চরিত্রের অতি উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন। (সুরা কালাম: ৪)

উন্নত নৈতিক চরিত্রের ভিতরে আসলে অনেক গুণাবলী চলে আসে যা অবশ্যই একজন দায়ীর মাঝে থাকতে হবে। যেমন,

১. ধৈর্যশীলতা

২. সত্যবাদিতা এবং কথা ও কাজে মিল থাকা।

৩. সাহসিকতা

৪. বিনয়ী

৫. দরদপূর্ণ মন

৬. আচার ব্যবহারে খুবই চমৎকার ও আন্তরিকতাপূর্ণ।

৭. উদারতা ও মহানুভবতা

৮. স্পষ্ট ও সুন্দর ভাষী

৯. দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী

১০. সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কুরবানির মানসিকতা।

এই সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোই মহানবী (সা.) চরিত্রে থাকার কারনেই মাত্র ২৩ বছরের মধ্যেই একটি অশিক্ষিত, মূর্খ, গোঁড়ামি সম্পন্ন, সন্ত্রাসী ও বর্ণবাদী জাতিকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। তাই আজকের দায়ীদেরও এরকম চরিত্র হতে হবে। তারা হবে এক একজন আবুবকর (রা.), ওমর (রা.) খাব্বাব (রা.), বেলাল (রা.), আয়েশা (রা.), উম্মে সালামাহ (রা.), রুমাইসা (রা.) ও হানজালা (রা.), তালহা (রা.) প্রমুখ।

৪। প্রজ্ঞা বা কৌশল অবলম্বন করা

একজন দায়ীর অবশ্যই পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী মানুষের মন মানসিকতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার করে দাওয়াতি কাজ করতে হবে। উপস্থিত পরিস্থিতিতে চিন্তা ভাবনা করে কোন কথা বা পদক্ষেপটা সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হবে সেভাবে মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে। এই বিশেষ গুণাবলীকেই আল্লাহ হিকমাহ বলেছেন।

সুরা নাহল ১২৫

ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ

"আপনি আপনার প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করুন হিকমত বা প্রজ্ঞা দ্বারা এবং সুন্দর উপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে উৎকৃষ্টতর পদ্ধতিতে আলোচনা-বিতর্ক করুন।" (সুরা নাহল: ১২৫)

৫। উন্নত প্রচার মাধ্যমগুলো ব্যবহারের দক্ষতা

বর্তমানে পৃথিবী সবার হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। বিছানায় শুয়ে থেকেও পুরো পৃথিবীর সব খবর, জ্ঞান বিজ্ঞান এমনকি সামাজিকতা পর্যন্ত করে ফেলছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ এত বেশি তৎপর যে এই মাধ্যমগুলোই নির্ধারণ করে দিচ্ছে আমাদের জীবন-যাপনের সীমা পরিসীমা। একজন দায়ীকে এ মাধ্যমগুলো ব্যবহার জানতে হবে এবং এগুলোর মাধ্যমেও আল্লাহর দিকে সবাইকে ডাকতে হবে। ইসলাম বিরোধী শক্তি এই মিডিয়া গুলোকে এত বেশি ব্যবহার করছে তাদের দাওয়াতি কাজ করার জন্য যে ভাল ভাল মুসলমানগনও অনেক ক্ষেত্রে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছেন। (মায়াজাল্লাহ)

দাওয়াতের পদ্ধতি

দাওয়াত দানের ক্ষেত্রে ৩ টি মৌলিক পদ্ধতি রয়েছে:

১. মৌখিক, বক্তৃতা, আলোচনা, দারসুল কোরআন, দারসুল হাদিস, ওয়াজ, নসিহত, সভা, সমাবেশ, সেমিনার, ব্যক্তিগতভাবে কথা দিয়ে বোঝানো এগুলো সবই মৌখিক দাওয়াতের মাঝে পড়ে।

২. লিখিত বই লিখা, কোরআনের তাফসির, হাদিসের দারস লিখা, বিভিন্ন বিষয়ে আর্টিকেল লিখা, ব্লগে লিখালিখি, বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় দাওয়াতিমূলক পোস্ট দেওয়া।

৩. চারিত্রিক নিজের আচার ব্যাবহার, চরিত্র মাধুর্য দিয়ে দাওয়াত।

বর্তমান সময়ে দাওয়াতের আরো কিছু পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন

১. **অনলাইন ভিত্তিক দাওয়াত:** ইউটিউব চ্যানেল, নিজস্ব টিভি চ্যানেল, দাওয়াতি ওয়েবসাইট, সকল সোশ্যাল মিডিয়াগুলো (ফেসবুক, ইন্সট্রাগ্রাম, টুইটার ইত্যাদি) দাওয়াতি একাউন্ট তৈরি করে অডিও, ভিডিও, লিখিত পোস্ট দিয়ে ইসলামের সুমহান বার্তাকে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে হবে। এছাড়াও

২. বিভিন্ন এক্সিভিশন, স্ট্রিট দাওয়াহ, দাওয়াহ সেন্টার তৈরি করে দাওয়াত দেওয়া প্রয়োজন।

৩. জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে দাওয়াত। এলাকায়, ওয়ার্ডে, বারাহতে এমনকি ব্যক্তিগত ভাবেও যে কোন কল্যাণ বা সমাজসেবামূলক কাজের মাধ্যমে কমিউনিটিকে দাওয়াত দেওয়া।

৪. মহিলাদের মাঝে মহিলাদের ওয়ান টু ওয়ান দাওয়াহ করাও

জরুরি। আজ মহিলাদের মধ্যেই ইসলাম নিয়ে অনেক ভুল ধারনা তাই মুসলিম মহিলাদের অনেক বেশি দক্ষতা, যোগ্যতা, শিক্ষা এবং প্রজ্ঞা অর্জন করতে হবে এবং আল্লাহর দিকে মহিলাদের ঠিক ধারনার দাওয়াত দিতে হবে।

কিছু বাস্তবপন্থা

১. ব্যক্তিগত দাওয়াতে প্রথমে সেই ব্যক্তির সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করতে হবে।

২. তার বিপদে এগিয়ে যাওয়া, উপহার আদান প্রদান করা, খাবারের আয়োজন করা, মানসিক আশ্রয় দেওয়া অর্থাৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা।

৩. পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী এবং তার মন মানসিকতা বুঝে যে বিষয়গুলোতে তাকে দাওয়াত দেওয়া উচিত সে বিষয়গুলোতে দাওয়াত দিতে হবে।

৪. ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক দাওয়াতে কখনো উত্তেজিত স্বরে তর্ক বিতর্কে যাওয়া যাবে না। যদি যুক্তি প্রদান করতে হয় কোন বিষয়ের বিপরীতে তখনো রাগান্বিত সুরে নয় বরং মোলায়েম স্বর ও আন্তরিকতার সাথে যুক্তি উপস্থাপন করতে হবে।

৫. আমাকে জিততেই হবে, তাকে আল্লাহর পথে নিয়ে আসতেই হবে এই মানসিকতা পরিহার করতে হবে। রসুল (সা.) কেই আল্লাহ বলেছেন "তোমাকে আমি উকিল করে পাঠাইনি।" (সুরা ইসরা: ৫৪) তাই ৫ জোর করে আইন দিয়ে বাধ্য করে কাউকে নিয়ে আসা যাবে না।

৬. যদি কথাবার্তা ঝগড়া বিবাদের দিকে যেতে পারে মনে হয় তখনই পরিবেশ ভালোর দিকে নিয়ে আসার চেষ্টা করতে হবে। "আপনার জামার রঙটি আমার খুবই পছন্দ হয়েছে।" "চলুন খেতে যাই।" "আজ নয় আরেকদিন এ বিষয়ে কথা বলব।"

৭. কোন বিষয়ে ভালো জানা না থাকলে কখনো ভুল উত্তর দেওয়া যাবে না। "এ বিষয়ে আমি ঠিক বেশি জানি না। দেখি এ ব্যাপারে পড়ালেখা করে আমি আপনাকে জানাবো।"

৮. মন্দ কথার জবাব ভাল দিয়ে দিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে গালমন্দ শুনতে হতে পারে। আল্লাহ ও রসুল (সা.) কোরআন ও ইসলাম নিয়ে অনেক বাজে কথা তারা বলতে পারে কিন্তু এর জবাবে দায়ীকে মন্দ কথা বলা যাবে না, বরং যুক্তি দিয়ে তাদের ভুল ধারনার অপনোদন করতে হবে।

৯. কোন সময় দাওয়াত দিলে সবচেয়ে উত্তম হবে সেই সময় এলেই সুযোগ নিতে হবে কোন রকম ভয় বা দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাখা যাবে না।

১০. জনকল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে হবে। হতে পারে তা এলাকায়, স্কুলে বা প্রতিষ্ঠানে, কাজের জায়গায় এমনকি রাষ্ট্রে। যত সামান্যই হোক হতে পারে রাস্তার ময়লা পরিষ্কার করার মত কাজ, ডাস্টবিন পর্যাপ্ত নেই তার জন্য সঠিক প্রশাসনের কাছে যেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা।

১১. যেকোনো অন্যায় কাজের নির্মূলে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে হবে। ড্রাগ এডিক্ট, এন্টি সোশ্যাল বিহেভিয়ার, গ্যাংফাইট বা নাইফ ক্রাইম যেকোন ইস্যুতে প্রয়োজনীয় ভূমিকা রাখার চেষ্টা করা।

১২. সব সময় আল্লাহর সাহায্য চাইতে হবে। আল্লাহর কাছে দোয়া চাইতে হবে এবং মুসা (আ.) শিখানো দোয়া পড়তে হবে।

قَالَ رَبِّ ٱشۡرَحۡ لِي صَدۡرِي ٢٥ وَيَسِّرۡ لِيٓ أَمۡرِي ٢٦ وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ٢٧ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي ٢٨

মুসা বললো, "হে আমার রব! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও এবং আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। এবং আমার জিভের জড়তা দূর করে দাও, যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (সুরা ত্বাহা: ২৫-২৮)

শেষ কথা

বিশ্ব মানবতা আজ খুবই দ্বিধা বিভক্ত। খ্রিষ্টান, হিন্দু, ইহুদি এমন কি মুসলমানরাও অনেকেই তাদের ধর্ম মানছে না। বিজ্ঞান বা যুক্তি মানতে এসে সেখানেও সব কিছুর উত্তর পাচ্ছে না। আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয়ে নাস্তিক হয়েও আবার প্রয়োজনে আল্লাহকেই ডেকে বসে। সব পুরাতন বাদ দিয়ে নতুন কিছুর আশায় কেউ নতুন ইজম, মতবাদ, দর্শন বানাচ্ছে আবার কতদিন পরে সেগুলো নিজের জন্মস্থানেই আত্মহত্যা করছে। কেউ আবার জেন্ডারকে জীবনের পূর্ণাঙ্গ মটো বানিয়ে ট্রান্স জেন্ডার, হোমো সেক্সুয়ালিটি বা উভয় সেক্সুয়ালিটির দিকে ছুটছে আবার কতদিন পরে তারাই বলছে এটা ভুল।

আল্লাহ বলেন, যারা আল্লাহকে ভুলে যায় তারা একসময় নিজেদের পরিচয়ও ভুলে আত্মভোলা হয়ে যায়।

وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمۡ أَنفُسَهُمۡۚ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ١٩

"তোমরা তাদের মত হয়ো না যারা আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহ তাদের নিজেদেরকেই ভুলিয়ে দিয়েছেন। তারাই ফাসেক।" (সুরা হাশর: ১৯)

তাই আমাদের দায়িত্ব অনেক, এই দিকভ্রান্ত আত্মভোলা মানুষগুলোকে সত্য সুন্দরের পথ দেখাতে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্য আমাদের প্রত্যেককে হতে হবে আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদের তার দায়ী হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

সংগঠন সংবাদ

দাওয়াতি কার্যক্রম:

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন সাউথহ্যাম্পটনের উদ্যোগে কোরআন এবং ইসলামী সাহিত্য বিতরণ।

দাওয়াহ স্টল এবং ফুড ব্যাংক, ইস্ট লন্ডন

চাডওয়েল হিথে নিয়মিত দাওয়াহ স্টল

তরুণ প্রজন্ম শেফিল্ডে দাওয়াতি কাজে

ক্যান্টিস টাউনে দাওয়াতি কাজ

ক্যামব্রিজে দাওয়াতি কাজ

বার্মিংহামের ভাইয়েরা নিয়মিত দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করেন।

ওয়ালসলে শাহাদাহ

কিলবার্ন এ দাওয়াহ স্টল

মুসলিম এসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল এন্ড স্টুডেন্ট (MAPS) এর উদ্যোগে ঈদ পুনর্মিলনী।

ঈদ পুনর্মিলনী এমসিএ ওয়েস্ট লন্ডন রিজিওন

ইস্ট লন্ডনের ভ্যালেন্টাইন পার্কে ঈদের নামাজে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন এমসিএর জেনারেল সেক্রেটারি হামিদ হোসাইন আজাদ।

ওয়ালসলে ঈদের জামায়াত

বার্মিংহাম জামে মসজিদে ঈদের জামায়াত

লুটনে ঈদের জামায়াত

ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান:

বি'র এবং আদলের কাজঃ

স্ট্রীট ক্লিনিং লন্ডন north-west রিজিওন

ফুড ব্যাংক Yorkshire and Humber রিজিওন

ব্রাডফোর্ড এ কমিউনিটি ক্লিন আপ অপারেশন

স্ট্রীট ক্লিনিং in Scunthorpe

রামাদান

রামাদান লাইভ:

এমসিএর উদ্যোগে সমগ্র রমাদান মাসব্যাপী প্রতিদিন রামাদান লাইভচ নামে অনলাইন আলোচনার আয়োজন করা হয়। কুরআন, হাদিস, রামাদানের মাসয়ালা মাসায়েল, দাওয়াতি কাজের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখেন এমসিএর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এবং বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামগণ।

ইফতার মাহফিল:

রামাদান ছিল এমসিএর জন্য অত্যন্ত একটি ব্যস্ত মাস। কুরআন নাজিলের এই মাসে সারাদেশে ব্যাপকভাবে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। আত্মগঠনের পাশাপাশি ভাই এবং বোনেরা কমিউনিটির সকলের সাথে মিলে ইফতার করাকে গুরুত্ব আরোপ করেন।

যুবকদের নিয়ে- ইফতার লন্ডন ইস্ট রিজিওন

রামাদান ফুড শেয়ার

ওয়েস্ট মিডল্যান্ড এ

সাউথ ওয়েস্ট লন্ডন রিজিওন

শেফিল্ড এ ইফতার মাহফিল

ইস্ট লন্ডন মসজিদে যুবকদের নিয়ে ইফতার

লন্ডন রিজিয়ন দায়িত্বশীলদের নিয়ে এমসিএর ইফতার মাহফিল।

non-muslim ইফতার লন্ডন north-west রিজিওন

শিক্ষা শিবির

সদস্য শিক্ষা শিবির

কর্মী শিক্ষাশিবির, লন্ডন south-west রিজিওন

কর্মী শিক্ষাশিবির-লন্ডন ইস্ট এন্ড নর্থ ইস্ট রিজিয়ন

লিসবনে দাওয়া কনফারেন্স

অন্যান্য সংবাদঃ

মুসলিম কমিউনিটি এসোসিয়েশন এমসিএ এর রিজিওনাল লিডার-শিপ কনফারেন্সে কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ মোসলেহ ফারাদী।

সম্প্রতি ১৪/০৫/২০২২ তারিখে এমসিএ এর রিজিওনাল লিডারশিপ কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভার্চুয়ালি অনুষ্ঠিত এই সমাবেশের প্রথমভাগে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি শেখ মোসলেহ ফারাদী। কেন্দ্রীয় সভাপতি তার বক্তব্যে রিজওনাল লিডারদের কে সংগঠনের কেন্দ্রীয় এবং মাঠপর্যায়ের কর্মীদের মধ্যে যোগাযোগের বন্ধন হিসেবে বর্ণিত করে সকলকে সুদুরপ্রসারি প্লান, দক্ষতা এবং সর্বোচ্চ যোগ্যতার সাথে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি কে ব্যবহার করে দাওয়াতে দ্বীনের কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনের দ্বিতীয় ভাগে সভাপতিত্ব করেন এম সি এ এর জেনারেল সেক্রেটারি হামিদ হোসাইন আজাদ। সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারি নুরুল মতিন চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল সেক্রেটারি ডক্টর দিলদার চৌধুরী, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান জিলু, দাওয়া সেক্রেটারি হাফেজ আবুল হোসেইন খান, ডিজিটাল ট্রানসফর্মেশন সেক্রেটারি ডঃ আশরাফ মাহমুদ, বী'র সেক্রেটারি নেছার আহমেদ, আদল সেক্রেটারি মাহফুজ নাহিদ প্রমুখ।

রিজিওনাল নেতৃবৃন্দের মধ্যে থেকে বক্তব্য রাখেন হাফেজ এরশাদ উল্লাহ, রাজু মোহাম্মদ শিবলী, সালেহ আহমদ, ছমির উদ্দিন, এমদাদুল্লাহ মাহবুব, মোহাম্মদ সালাহউদ্দিন, সৈয়দ তোফায়েল হোসেন, মনজুর আহমেদ, আনসার মুস্তাকিম, রেজাউল করিম চৌধুরী, গিয়াস উদ্দিন, রাইসুল ইসলাম, ডক্টর মনোয়ার হোসেন, জাহিদ ইসলাম, কয়েস আহমেদ , মনিরুজ্জামান হাজরা, আবুল হোসেন রায়হান, আব্দুস সালাম মাসুম, আজাদ মিয়া প্রমুখ।

সম্মেলনের সার্বিক কাজের পর্যালোচনা করা হয়।

জেনারেল সেক্রেটারি হামিদ হোসেন আজাদ তার সমাপনী বক্তব্যে নেতৃত্বের ৯ টি গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী তুলে ধরেন;

১. integrity (honesty, truthfulness, reliability and being source of solution). সততা ও সত্যবাদিতা, নির্ভরযোগ্যতা এবং সমস্যা সমাধানের উৎস।

২. Ability to delegate, কাজ ভাগ করে দেওয়া

৩. Clarity in Communication, যোগাযোগে স্বচ্ছতা

৪. Self awareness, আত্ম সচেতনতা

৫. Gratitude, কৃতজ্ঞতা

৬. Learning agility, জ্ঞান অর্জনে তৎপর

৭. Influence, প্রভাব

৮. Emphath, সহানুভূতি

Above all:

৯. RELIANCE ON ALLAH (SWT) with utmost love. সর্বোপরি পরম ভালবাসার সাথে আল্লাহ (SWT) এর উপর নির্ভর করুন।

ইস্ট মিডল্যান্ড অঞ্চলের উদ্যোগে নতুন দাওয়াত সেন্টার অফিসে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

লিডস অঞ্চলের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মেইনল্যান্ডের উদ্যোগে লিডারশীপ ক্যাম্প অনুষ্ঠিত।

এমসিএ এর উদ্যোগে যুবকদের নিয়ে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইতালির বোলনিয়া শাখার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিভাগীয় ও অঞ্চলের সদস্যদের নিয়ে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়েস্ট মিডল্যান্ড স্টাফোর্ডশায়ার অঞ্চলের উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আলোরপথ